সিদ্ধসাধক
তারাক্ষ্যাপা

ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা

সূচনা

গ্রন্থের বিষয়ীভূত মহাতপা সিদ্ধসাধক শ্রীমৎ তারানাথ মহারাজ ত্রেতা-যুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বজ্ঞান-গুরু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের সাধনসিদ্ধ মহাপীঠ তারাপীঠাধিষ্ঠাত্রী দীন-দয়াময়ী তারামায়ের আদরের দুলাল মহাযোগী মহর্ষি শ্রীমৎ বামদেবের একমাত্র সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ও তৎস্থলাভিষিক্ত পীঠাধীশ এবং বশিষ্ঠারাধিতা তারাসাধনার শেষ ধারক ও বাহক। ক্ষ্যাপাজী তারানাথের জীবনচরিত এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তাঁর জীবনবেদ সম্পর্কে প্রচারের প্রচেষ্টাও তেমন কিছু করা হয়নি। ফলে তাঁর পূত পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত আজ জনমানস থেকে অপসৃয়মান। এর কারণ প্রধানতঃ তাঁর নিজেরই আত্মপ্রচারে বিমুখতা। একদা বামলীলা গ্রন্থের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় ৺ হরিচরণ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ তারানাথজীকে পড়ে শোনান। তিনি শাস্ত্রীজীকে ভর্ৎসনা করে বলেন, ভিক্ষুর জীবনচরিত হয়না; তাঁর সাধনপদ্ধতি, আচার আচরণও সকলের বিশেষতঃ গৃহস্থের উপযোগী নয়। তাঁর উপদেশাবলীই কেবল সকলকে জানান যেতে পারে মাত্র। সাধারণতঃ তিনি সকলকেই রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্ডী যোগবাশিষ্ঠ ও পুরাণাদি পড়তে উপদেশ দিতেন। তারানাথের এই মত-নির্দ্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বক্ষ্যমান চরিতালোচনায় তারানাথের বহিরঙ্গ জীবনেরই কতিপয় ঘটনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে মাত্র; কারণ মহাযোগী ও সিদ্ধসাধক-গণের অধ্যাত্মজীবন ও সাধনতত্ত্বের ভাবরাশি সাধারণ মানুষের অনুভব ও বোধগম্য নহে। যিনি স্বীয় ইষ্ট ভগবান বা ভগবতীর ভাবে যতদূর তন্ময়তায় নিমগ্ন, তিনি ততদূর তদাত্মতা লাভ করেন। যে তদাত্মকভাবের প্রবাহ-প্রভাবে সাধনায় তন্ময়তা-সিদ্ধি, সেই তদাকারিত তত্ত্বভাবুকের হৃদয়েই কেবল উহা গোচরীভূত। তদাত্মক-চিত্ত তৎস্বরূপে নিমজ্জিত আত্মহারা ব্যতীত অপরের তাহা উপলব্ধি করা বা বলবার অধিকার ও যোগ্যতা নাই। ভবানীপতি শক্তিনাথ শঙ্কর স্বয়ং আপনভাবে আপনি বিভোর হয়ে বলেছেন, ভাবের স্বরূপ বাক্যের দ্বারা বুঝাবার নহে। স্পষ্টতই সে-ভাবের স্বভাব বা প্রকৃত রূপ বুঝাবার দিব্যশক্তি ও দক্ষতা সাধারণ সংসারাক্ত জীবের কোথায়? এবিষয়ে ভগবান শক্তিনাথ যাহা নির্দ্দেশ করেছেন সেই পর্য্যন্তই আমাদের সাধ্যায়ত্ত। লৌকিকভাবে তর্কের দ্বারা

ইহার বিচার করা চলে না বা অনুভব ও অনুভূতির আস্বাদন সম্বন্ধে ধারণা করাও যায় না।

মহাত্মা ও মহাপুরুষগণের জীবনচরিত প্রকাশ বিষয়ে স্বয়ং তারানাথের পূর্ব্বোক্ত মতানুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন আজ এ জীবনচরিত প্রকাশ করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সহৃদয় সুধী ভক্ত পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করা হল।

শিবাবতার ক্ষ্যাপাজী তারানাথের জীবনবেদ রচনার মত দুঃসাহসিক কার্য্যারম্ভ করবার বিষয় কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। প্রথমত সিদ্ধসাধক মহাপুরুষদের জীবনী রচনা সম্পর্কে মহাত্মা তারানাথের অভিমত এবং দ্বিতীয়ত সিদ্ধযোগী মহাতাপসগণের অন্তহীন অনন্ত আকাশ ও অসীম অতল মহাসাগর সদৃশ মহাজীবন মানবীয় বিদ্যাবুদ্ধির অগোচর। মাদৃশ সাধারণ সংসারী মানুষ তারানাথের ন্যায় উগ্র তাপস ও সিদ্ধমহাপুরুষের জীবনরহস্য উদঘাটন ও পরিমাপ করবে কি প্রকারে? আমার সহোদর প্রতিম শ্রীপ্রতুল কুমার দত্ত বৎসরাধিকাল যাবত তারানাথের জীবনচরিত রচনা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার জন্য পুনঃপুনঃ তাগাদা করতে থাকেন। তাঁর তাগাদার প্রবল চাপে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। লোকপরম্পরা একথা জানতে পেরে ক্ষ্যাপাজীর স্নেহাশীষ-ধন্য স্বদেহে বর্ত্তমান আরও অনেক ভক্তগণের নিকট হতেও পত্রযোগে তারানাথের একখানা জীবনচরিত প্রকাশ করবার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ আসতে থাকে। তারানাথের জীবনচরিত রচনা করবার মত সাধনার যোগ্যতা ও শক্তি আমার কোথায়? এসব ভেবে মনের শান্তি বিঘ্নিত হল, ফলে রাত্রিতে চোখে নিদ্রা নাই। গভীর নিশীথে সাশ্রুনয়নে সকাতরে তারানাথকে প্রার্থনা জানিয়ে বলি, ঠাকুর। জীবনসায়হ্নে আমাকে তুমি এ কি ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় ফেললে? সাধক মহাত্মাগণের জীবনায়ণ রচনা সম্বন্ধে তোমার সুস্পষ্ট অভিমত জানা সত্ত্বে কি করে গুরুর মতানুশাসন লঙ্ঘন করি? আমি দুরতিক্রম্য সমস্যায় আপতিত হয়ে অসহায় দিকভ্রষ্ট! এ বিষম বিপদে এক গুরু ভিন্ন আমায় কে রক্ষা করতে সমর্থ? তুমি আমায় চলার পথে আলো দেখাও, পথ-নির্দ্দেশ কর। ধ্যানাবস্থায় সহসা স্মৃতিপথে শাস্ত্রবাণী উদিত হল, সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং, তীর্থভূতা হি সাধবঃ কালে ফলন্তি তীর্থানি সদা সাধু সমাগমঃ। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সিদ্ধসাধক মহাত্মাগণকে তীর্থস্বরূপ রূপেই বর্ণনা করে গেছেন। সুতরাং সাধক মহাপুরুষ মহাত্মাগণের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক প্রসঙ্গালোচনা ও অনুশীলন

তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণের ন্যায়ই শুভফলপ্রদায়ক। বিস্ময়ে রুদ্ধবাক আমি! স্মরণপথে শাস্ত্রবাণীর এ আবির্ভাব কি তারানাথেরই ইচ্ছা-ক্রিয়াশক্তি-সম্ভূত আমার সমস্যা উত্তীর্ণ করানোর পথনির্দ্দেশ বা ইঙ্গিত? গুরু-আজ্ঞা বিনা লঙ্ঘনে আমার দ্বারা তাঁর বাহ্য-জীবনের চরিতকাহিনী বিরচিত করিয়ে ভক্তগণের বহু আকাঙ্খিত মহাপুরুষ চরিতকথা প্রকাশের সমস্যা সমাধান করে দিলেন তারানাথ! ধন্য ঠাকুর! তোমাদের রহস্যঘেরা মর্ম্মকথা বোঝে সাধ্য কার?

এ ঘটনার পর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও ভক্তগণের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ এবং সিদ্ধান্তানুযায়ী পাণ্ডুলিপি রচনা আরম্ভ হয়। তারানাথের এই চরিতায়ণে তার কেবল বহিরঙ্গ জীবনের কতিপয় ঘটনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে মাত্র, সাধনজীবন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবেশ করা হয়নি। ইহার কারণ ইতিপূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

ভারত বিভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে পরশাসন-মুক্তির পর ভারতের মুক্তি আন্দোলনের যোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক অফিস অফ্ দি রিজিওন্যাল মেম্বার্স্-এর মাননীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম. এ, পি-এইচ্. ডি, বি. লিট্ মহাশয় হিষ্ট্রী অফ্ ফ্রিডম্ মুভমেন্ট্ ইন্ ইণ্ডিয়া এণ্ড ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কমিটি, রাইটার্স বিল্ডিংস্ থেকে ১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবর তারিখের মিস্‌লে ৫৩-৫৪।৪৭ এল. ডবল্যু. বি. নভেম্বরের পত্রে মহর্ষি তারানাথের অন্তরীণ ও রাজনীতি সম্পর্কিত এবং সমাজ কল্যাণমূলক কার্য্যাবলীর বিবরণ আমাদের নিকট চেয়ে পাঠান। এ সংবাদ আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহলের বন্ধু পরলোকগত রাজবন্দী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রাজনীতিক মহলে তিনি কিরণদা নামেই সমধিক পরিচিত) মহাশয়কে জানান হয়। তিনি আমাদের নিকট থেকে ক্ষ্যাপাজী তারানাথের একখানা সুদৃশ্য ফটো এবং ক্ষ্যাপাজী তারানাথ আশ্রম সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত তারানাথ সিরিজের দু'খানা পুস্তিকা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন। উপরোক্ত অফিস্ অফ্ দি রিজিওনাল মেম্বারস্ কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় অধ্যাপক (বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি. লিট্ ইং ১৮।১০।৫৪ তারিখের মিস্‌লে ৫৩-৫৪।৫১ এইচ্. এল. উবল্যু. চিহ্নিত পত্র দ্বারা পুস্তক দু'খানা ও ফটোটির প্রাপ্তি স্বীকার করেন। শেষ পর্য্যন্ত বিষয়টির কি গতি হল তদ্বিষয়ে পুনঃ পুনঃ খোঁজখবর করেও কোন সংবাদ আজ অবধি পাওয়া যায় নি। শোনা গেছে, উক্ত বই দুখানা ও ফটোটি ছাপা হয়নি।

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সদ্গুরু শ্রদ্ধেয় শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় তারানাথ সম্বন্ধে বলতেন, ক্ষ্যাপাদা আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অনুরূপ কথা পরলোকগত বিপ্লবীনেতা বারীন ঘোষ মহাশয়ও আমাদের আশ্রম সমিতির অফিসে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লব প্রচেষ্টার কাহিনী আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়শঃই বলতেন। ক্ষ্যাপাজীর দেহরক্ষার পর মতিলাল রায় মহাশয় বলেছিলেন : স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে ও জাতিগঠনে মহাত্মা তারানাথের অবদান অপরিমেয় ও অবিস্মরণীয়।

রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনায় দেশজননীর মুক্তিযজ্ঞে মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজদিগকে যেমন আহুতি দিয়েছেন অপরদিকে বিশ্বজননীর বিশ্বব্যাপিনী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অনেক অধ্যাত্ম-সাধকও জাতীয় মুক্তিসাধনাকে অধিকতর বেগবান করে তুলেছিলেন তাঁদের আপন আপন অবদানে। মূলতঃ তিনি অধ্যাত্ম সাধনার বলে আত্মমুক্তি কামনায় গৃহ ও সংসারত্যাগী হয়েও অপরাপর যোগী এবং সাধকগণের ন্যায় কেবল স্বীয় মুক্তিসাধন প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করে সীমিত করে রাখতে পারেন নি। মাতৃসাধক তারানাথ স্বীয় ইষ্টদেবী ও দেশমাতৃকাতত্ত্বের একাত্মতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনাকে আত্মমুক্তির উর্দ্ধে অগ্রাধিকার দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলন সংগঠন ও বিপ্লবতত্ত্ব প্রচারে আত্মনিয়োগ করে দেশমাতৃকার মুক্তি-আন্দোলনে যোগদানকারীগণের সঙ্গে সংপৃক্ত হ'লেন তাঁদের উৎসাহ ও প্রেরণা-প্রবাহের আঁধারস্বরূপে। তিনি সর্ব্বদাই বলতেন, পরাধীন জাতির সাধন ভজন হয় না। বিজিত জাতির জীবনে পরাধীনতা একটা ভীষণ অভিশাপ! ভিন্ন দেশাগত বিজয়ী জাতির শাসন পরাধীন দেশে সর্ব্বদা বিজিত জাতির স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত থাকে। বিজয়ী শাসকজাতি বিজিতজাতিকে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতিক দিক থেকে শোষণ করেই পরিতুষ্ট থাকে না; বিদেশাগত বিজয়ী জাতির মনোমধ্যে বিজিতদেশে চিরস্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত থাকবার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত থাকে। ফলে বিজিত জাতির জীবনে পরাধীনতাপ্রসূত কুফলগুলি ক্রমে প্রকট হয় ভাবে ও আদর্শে; কর্ম্মে দেখা দেয় হীনমন্যতা, আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতা। জীবনের শক্তির কেন্দ্রসমূহ হয় ধ্বংস ও বিধ্বস্ত।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বহরমপুরের শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল মহাশয় বলেন, "...প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় বামাক্ষ্যাপার একমাত্র মন্ত্রশিষ্য তারাক্ষ্যাপা বহরমপুর সহরের পুবলাগা উমাবনে বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন। তিনি সুভাষের অনেক আগেই সন্ন্যাসী রাজবন্দী হয়ে সন্দীপ

(হাভিয়া) দ্বীপে অবতীর্ণ ছিলেন। ভিয়েনাতে ভিঠলভাই প্যাটেলের অন্তিম রোগশয্যায় সুভাষ যখন দিনরাত শুশ্রূষায় নিয়োজিত, অশরীরী তারাক্ষ্যাপা তখন সেখানে ছিলেন। মহর্ষি তারাক্ষ্যাপার নিজের কাছেই আমার এই অবগতি…" (সুভাষ নেপথ্যে—বেতার জগৎ, ৪৩ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : ১৭ই পৌষ, ১৮৯৩ শকাব্দ ; ৭ই জানুয়ারী ১৯৭২ খৃঃ, পৃঃ ৫৫)।

যেমন রাষ্ট্রীয় সাধনক্ষেত্রে তেমন অধ্যাত্মসাধন রাজ্যেও মহাতাপস তারানাথ কোন কোন সাধককে স্বীয় তপঃশক্তিবলে প্রভাবান্বিত করেছেন। তারাপীঠ ভৈরব শ্রীশ্রীবামদেবের সহিত একসঙ্গে শ্রীশ্রীকৈলাসপতি ব্রজবাসী যেমন সাধনভজন করতেন তেমনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বংশীয় প্রভুপাদ সাধক শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও তারানাথবাবার সহিত অন্তরঙ্গভাবে সাধনভজনাদি করতেন। এ বিষয়ে এই প্রভুপাদ গোস্বামী মহারাজও বলতেন, ক্ষ্যাপাবাবা তারানাথ তাঁর জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। একথা প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী মহোদয়ও তাঁর রচিত প্রভু অতুলকৃষ্ণ পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনায় আত্মোৎসর্গকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীঅরবিন্দ-অগ্রজ বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ, পশ্চিম বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব মাননীয় মন্ত্রী (সম্প্রতি পরলোকগত) ভূপতি মজুমদার, পরলোকগত রাজবন্দী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবর্ত্তকসংঘ-গুরু মতিলাল রায়, দমদম মতিঝিল্ নিবাসী ডাঃ অশ্বিনীলাল রায় প্রভৃতি জীবনে ক্ষ্যাপাজী তারানাথের প্রভাবে কতখানি প্রবুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা তাঁদের পত্রাদির মর্ম্ম থেকেই সুস্পষ্ট।

মহাযোগিনী মাতাজী গঙ্গাবাঈ-এর মহাত্মা তারানাথের ধর্ম্মীয় ও রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনার ক্ষেত্রে সংযোগ থাকায় এই পূত জীবনালেক্ষ্য রচনায় মাতাজীর পরিচয়, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মীয় জীবনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মাতাজী সম্বন্ধে সাময়িক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এতাবৎ যে সকল নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে উহার একটি তালিকা এই গ্রন্থের ২৮—২৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে পাঠকবর্গের উভয় সাধকের বিষয়ে বোধ সৌকার্য্যার্থে। আরও দুটি নিবন্ধ এবং উহাদের লেখকের নাম, বার্দ্ধক্যজনিত ভ্রম হেতু উপরোক্ত তালিকায় সন্নিবিষ্ট হতে পারে নাই বলে একণে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল : (১) মাতাজী মহারাণী গঙ্গাবাঈ—উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী (উপাসনা—আশ্বিন, ; ১৩২৫ সন) (২) মাতাজী গঙ্গাবাঈ—জর্জ্জ এ্যালেন (মাসিক বসুমতী ; ভাদ্র, ১৩৭৭ সন)।

এই গ্রন্থ রচনায় যাঁহারা পত্র ও তথ্যাদি সরবরাহ করে সহায়তা দান করেছেন বিশেষতঃ অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমণিভূষণ ভাদুড়ী এবং ক্ষ্যাপাবাবার কৃপাধন্য আবাল্য ব্রহ্মচারী চাঁইবাসা টেম্পল রোড নিবাসী শ্রীফণিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়গণ—তাঁদের সকলকেই জানাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত ক্ষ্যাপাবাবার সিংভূমে বিদ্রোহের প্রচার এবং সিংভূম বিদ্রোহের ইতিহাস সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ উক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় প্রেরিত তাঁর স্বরচিত রচনাবলী অবলম্বনে প্রদত্ত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি রচনায় শ্রীমান আশীষ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীসুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়-এর (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক) আন্তরিক সহযোগিতা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি; এঁদের সাহায্য না পেলে পাণ্ডুলিপি তৈরী হতে বহু বিলম্ব হত।

বার্দ্ধক্যজনিত অপটু দেহ ও ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ দৃষ্টিশক্তিহেতু গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদ প্রবেশলাভ করেছে। সুধী ভক্ত ও সহৃদয় পাঠকগণ আমার উপরোক্ত শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে গ্রন্থের এসকল ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন। পরবর্ত্তী সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত উন্নত সংস্করণ সম্বন্ধে তাঁদের নির্দ্দেশাদি সাদরে বিবেচিত ও গৃহীত হবে।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, এই সংস্করণে কাগজ ও মুদ্রণ মূল্যের দুর্ম্মূল্যতার জন্য আরও অনেক সংগৃহীত তথ্য সন্নিবেশিত করা গেল না; ইহাতে লেখক খুবই মর্ম্মাহত। ৺জগদম্বা যদি এই অকিঞ্চনকে আর কয়েকটি বৎসর এদেহে বর্ত্তমান রাখেন তবে ঐ সকল অপ্রকাশিত সংগৃহীত তথ্যাদি সম্বলিত পরবর্ত্তী পরিবর্দ্ধিত শোভন সংস্করণ প্রকাশের বাসনা রহিল। সকলই শ্রীগুরুর ইচ্ছা।

পরিশেষে গ্রন্থমুদ্রণ কার্য্যে প্যারট্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীরণজিতবাবুর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগীতা না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ। এজন্য তাঁর নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। শ্রীভগবান ও মহাত্মা তারানাথের শুভাশীষ তাঁর উপর অজস্রধারায় বর্ষিত হউক।

অলমতিবিস্তারেণ—

ওঁ হংসঃ মট্ শ্রীমদ্‌গুরবে নমঃ।

সূচীপত্র

॥ এক ॥

সাধনায় সিদ্ধ হয় কার্য্য অগণন।
জগত ভাবেনি যাহা স্বপনে কখন ॥

ব্রহ্মচারী তারানাথের পূর্ব্বাশ্রমের নাম, বংশপরিচয় ও জন্মরহস্য

নিঃসন্তান দম্পতির পুত্রমুখ বিনা দরশনে হু-হু করে দিবানিশি কাঁদে প্রাণ, নিরন্তর ঝরে অশ্রুধার। মনপ্রাণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় সদা বিষন্ন, বিষাদ-ভারাক্রান্ত। সীমাহীন মর্ম্মপীড়া! তাঁদের হৃদয়ের দুঃসহ যাতনা এ জগতে কেউ বুঝে না। সন্তান না হওয়ায় পিতামাতা আত্মীয় স্বজন এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণ বংশরক্ষার জন্য পুত্রের পুনরায় বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু পুত্র এ পরামর্শে কর্ণপাত করেন না। রাজ্যের উচ্চপদের বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যাদি একান্ত নিষ্ঠাসহকারে করে চলেছেন। অবশেষে ধর্ম্মপ্রাণ বেদনার্ত্ত দম্পতি পুত্রার্থে নিজেদের বিনিয়োগ করেন কুলদেবতা বটুকভৈরবের সাধনারাধনায়। গভীর নিশীথে নিত্য নিয়মিত নিখুঁতভাবে গৃহদেবতার আরাধনা জপ তপ ধ্যান-ধারণা পূজা হোম ও বলিদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান শাস্ত্রসম্মত যথাবিধি করে চলেছেন সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল। এই সাধন সময়ে হৃদয়ের বিষন্ন আবেশে কখনও কখনও মনে হয় দেবতার আশীর্ব্বাদ ও কৃপালাভ বুঝি এ জীবনে আর হ'ল না! অবিরত সাধনার এক মহানিশায় নিরাশার নীরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র নিবিড় আঁধারে সহসা চমকিত হয়ে উঠেন সাধক-দম্পতি! হৃদয়গুহার অন্তরাকাশে বারত্রয় প্রতিধ্বনিত হয় আরাধিত দেবতার আশ্বাসবাহী আকাশবাণী 'মা ভৈঃ'। সম্মুখে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রাবৃটকালে নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎরাশির ন্যায় দীপ্তিতে উপাস্য দেবতার সুদীপ্ত ভাস্বর চিন্ময় বিগ্রহমূর্ত্তি! বিগ্রহমূর্ত্তি যেন আজ আরও প্রশান্ত,

আরও সমুজ্জ্বল! বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে ভাবেন সাধক-দম্পতি এই অচিন্তনীয় রহস্যঘেরা ঘটনার তাৎপর্য্য! যুক্তপাণি হয়ে আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন ভূলুণ্ঠিত ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। দৈববাণী পুনঃ উচ্চারিত হল, তোমাদের দুঃখের রজনীর অবসান অচিরে আগতপ্রায়। স্বয়ং আমি শরীর ধারণ করে সন্তানরূপে তোমাদের গৃহে আবির্ভূত হব; কিন্তু আমি দীর্ঘদিন গৃহবাসী হয়ে থাকব না।...অল্পবয়সেই গৃহত্যাগ করে জগৎ-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করব। এই অলৌকিক দৈব ঘটনার এক বৎসরের মধ্যেই ১৮৬৮ শকাব্দে, বাংলা ১২৫৩ সনের (ইং ১৮৪৬ খৃঃ) ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার শুভ কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে মহাত্মা ও সিদ্ধসাধকগণের পূত-সাধনভূমি দেবনিবাস দেবাত্মা হিমালয়ের উত্তরাখণ্ডস্থিত গাড়োয়াল[১] রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরে ব্রাহ্মণকুলে মাতৃক্রোড় আলোকিত করে আবির্ভূত হয়েন আবাল্য ব্রহ্মচারী সিদ্ধসাধক শিবাবতার তারানাথ। নবজাতকের নামকরণ হল প্রমথেশ।

বাল্যকাল থেকেই মাতামহীর অত্যধিক আদরে তারানাথ অত্যন্ত জেদী হয়ে উঠেন। পিতা অল্পবয়সেই পুত্রের উপনয়ন দিলেন।

বাল্যকাল

বালক তারানাথ মাতামহীর সঙ্গে গৃহদেবতার পূজা করতেন। সময় সময় গভীরধ্যানে এমন ডুবে যেতেন যে, বাহ্যজ্ঞান থাকত না! পূজা অর্চ্চনা করতে করতে বালক অষ্টাদশ অক্ষরের মন্ত্র পান! কৈশোরেই ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে বসে উপাসনা করতেন। পিতামাতা জানতেন, এই বালক ভৈরব—বেশীদিন হয়ত থাকবে না সংসারে, তাই মাতামহীর আদুরে দুলালকে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। পাছে হঠাৎ গৃহত্যাগ করে, এই আশঙ্কায় প্রমথেশের পিতা বালকের উপর নজর রাখার জন্য কয়েকজন ভৃত্যও নিযুক্ত করেন। দৈববাণী মিথ্যা হবার নয়। কৈশোরেই বার বৎসর বয়সে গভীর রাতে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প নিয়ে

গৃহের নিকটে এক আম বাগানে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু জননীর সদাজাগ্রত দৃষ্টি তিনি এড়াতে পারলেন না। মাতা নীরবে এসে পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত!

কৈশোরে গৃহত্যাগ

জননী ব্যাথা ও বেদনায় অশ্রু-উদ্বেলিত নয়নে পুত্রকে বুকে চেপে ধরলেন। চোখের জলে তার বুক ভেসে যায়! পুত্র কিন্তু অচল অটল, সংকল্পে স্থির—মাতার অশ্রু, স্নেহের বন্ধন, পরিজনদের ভালবাসা, বিত্তবৈভব ঐশ্বর্য্য কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারল না, বুদ্ধ চৈতন্য, শঙ্কর, ত্রৈলঙ্গস্বামী, বামাক্ষেপা প্রভৃতি অনেকানেক সাধক শ্রেষ্ঠদের মত। পুত্র মাতাকে কি যে ইঙ্গিত করলেন তা জানা যায় নি। মাতা অশ্রুপ্লুত নয়নে বিদায় দিলেন পুত্রকে!

॥ দুই ॥

ভূমা যাঁকে আকর্ষণ করেন, অসীমের পথে পাড়ি দিতে সে কি ভয় পায়? পার্থিব সুখ ঐশ্বর্য্যের বন্ধনে তাঁকে আবদ্ধ রাখা যায় না। সত্যানুসন্ধান ও আত্মমুক্তির অসীম পিপাসা নিয়ে তিনি পুণ্যভূমি হিমালয়খণ্ডের সকল তীর্থ একে একে পদব্রজে পর্য্যটন করে অবশেষে হরিদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। কে তাঁকে পথ দেখাবে? এখানে এসে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামীয় এক উচ্চকোটি মহাত্মার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার ঘটে। এই ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট তিনি হঠযোগাদি[২] কৃচ্ছ্রসাধন, বিভিন্ন আসন, মুদ্রা ও বন্ধনাদিতে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার নিকট এই সময় বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ শাস্ত্র গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে তিনি বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে পারঙ্গম হন। অতঃপর একে একে কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত অনন্তনাগ, পীর পাঞ্চাল, পঞ্চতরণী সঙ্গম, গিল্‌গিট, বন্দিপুর প্রভৃতি স্থানে সাধনা করেন। ইহাতেও তারানাথের অনন্ত অধ্যাত্ম-পিপাসা চরিতার্থ হল না। ১২৯০ বঙ্গাব্দে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রমথেশ (তারানাথ) হিন্দুর মহাতীর্থ হিমালয়ের অমরনাথ তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেন।

ভূমার অন্বেষণে হিমালয়ের যাবতীয় তীর্থভ্রমণ, পরে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট অষ্টাদশবিধ শাস্ত্রাদিপাঠ, হঠ-যোগাদি শিক্ষা গ্রহণ

শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হিমালয়ের এক প্রকাণ্ড গুহায় যুগ যুগ ধরে উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে তুষারপাতে স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র স্বচ্ছ পার্ব্বতী গণেশ ও শিবের তুষারলিঙ্গ গড়ে ওঠে। পুনঃ পূর্ণিমা তিথির পর থেকে অমাবস্যা পর্য্যন্ত এক পক্ষকাল মধ্যে মূর্ত্তি তিনটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আকারে খুবই ছোট হয়ে যায়। পীরপাঞ্চাল থেকে অমরনাথের পথ

অমরনাথ তীর্থে গমন, সেখানে তারানাথের অলোকসামান্য দিব্য জীবনেতিহাসের এক অলৌকিক অধ্যায়

চিরতুষারাবৃত। প্রমথেশ (তারানাথ) পদব্রজে অনন্তনাগ থেকে পীরপাঞ্জাল পর্য্যন্ত চৌদ্দ ক্রোশ পদযাত্রা করেন। সেখান থেকে পঞ্চতরণী ছ'ক্রোশ পর্য্যন্ত তুষারাবৃত নদী পার হয়ে দু'ক্রোশ দূরে অমরনাথ তীর্থে পৌঁছিলেন। গুহার মধ্যে আকাশ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি ঝড়ে পড়া তুষারকণা বিনির্ম্মিত তুষার মুর্ত্তি তিনটি দেখতে পেলেন। প্রথমটি শিবমুর্ত্তির সদৃশ, উচ্চতায় একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমান। বামে দ্বিতীয়টি সাধনরতা মাতা পার্বতীর, আর দক্ষিণে গণেশ মুর্ত্তি। প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা দেখে স্তম্ভিত হলেন ব্রহ্মচারী তারানাথ! প্রকৃতির এই বিস্ময়কর পরিবেশের মধ্যে হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ অমরনাথ। তারানাথ এই দেবভূমিতে তন্ময় হয়ে দেবাদিদেবের আরাধনা করলেন। ইহাই তারানাথের অলোকসামান্য দিব্য জীবনেতিহাসের একটি অলৌকিক অধ্যায়।

এখানে এমন একটি ঘটনা সকলের নয়নগোচর হ'ল যদ্বারা প্রমাণ হ'ল প্রমথেশ, পরবর্তীকালে তারাক্ষেপা, নিঃসন্দেহে একজন সিদ্ধপুরুষ। এখানে লোকের এ-রকম একটি ধারণা বদ্ধমূল আছে যে, এক নিঃশ্বাসে যদি কেহ বত্রিশটি তুষার বিন্দু পান করতে পারেন, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে সিদ্ধপুরুষ হবেন। তারানাথ এক নিঃশ্বাসেই বত্রিশটি তুষার বিন্দু সেদিন পান করেছিলেন।

মহাতীর্থ অমরনাথ তীর্থদর্শন করে তারানাথ ফিরছেন গানের সুর ধরে :

কত কাল ধরে ধরা ছুট্‌ছে তোমার পানে,
আকাশ আলো বাতাস তোমার
মুখর তোমারই তানে ।।
অনন্ত তোমারই নাম,
অজানা তোমারই ধাম,
ঠিক ঠিকানা কেউ জানে না
খুঁজছে কি একটানে ।।

তোমার বাঁধন চমৎকার,
নাইকো সুতা নাইকো তার,
হাত পা বাঁধা সবাকার
আপন আপন জ্ঞানে ॥
তোমার কৃপা বিনা প্রভু
কে তোমারে পেয়েছে কভু
তাই তোমায় ডাকি বিভূ
আমার অসার গানে ॥

অমরনাথ দর্শন করে ফেরবার পথে নেমে আসছেন তারানাথ উপত্যকা ভূমিতে। দীর্ঘপথ পর্য্যটনে দেহ ক্লান্ত, অবসন্নতা ঘিরে ফেলেছে সর্ব্বশরীর, মন চাইছে বিশ্রাম, অবসাদ ও ক্লান্তি নিরসন। আশ্রয় নিলেন গীর্ণাহার পর্ব্বত গুহায়। গীর্ণাহারের এই পর্ব্বত গুহাতেই তারানাথ চির-আকাঙ্ক্ষিত অধ্যাত্ম-জীবনের ইঙ্গিত লাভ করেন। এতদিনের অবিশ্রান্ত অন্বেষণ চরিতার্থ হয়ে উঠল, তাঁর সাধনজীবনে দেখা দিল সাফল্যের আলোকরশ্মি। রাত্রির ধ্যানগত অবস্থা থেকে সহসা চোখ খুলতেই দেখলেন বাল্যে যে স্নেহময়া মাতামহীর কোলে লালিত পালিত হয়েছেন, কিশোর বয়সে যাঁর ধর্ম্মবিশ্বাসে গৃহদেবতার অর্চ্চনাদি করতে শিখেছিলেন, সেই মাতামহীর ছায়ামূর্ত্তি হঠাৎ দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। একি মায়া, না ভবিষ্যৎ জীবনের পটভূমির ইঙ্গিত নির্দ্দেশ। যে আবাল্য ব্রহ্মচারী নির্ভীক সর্ব্বত্যাগী সাধক কিশোর বয়সেই গৃহত্যাগ করেছেন, তিনি কি এরূপ ঘটনায় বিচলিত হন? গীর্ণাহার পর্ব্বত হ'তে বেরিয়ে গন্তব্যপথে যাত্রা করার জন্য পাহাড় থেকে নীচের সমতলভূমির দিকে যাত্রা করলেন। চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক নিস্তব্ধ মূক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তারানাথ। এমন সময়

গির্ণাহার পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ ও নিজ গুরু দর্শন

গুরুগম্ভীর নাদে সমস্ত পর্ব্বতমালা প্রকম্পিত করে উচ্চারিত হল দৈববাণী 'বামা বীরভূম'।

হঠাৎ চোখের সামনে সংঘটিত হল এক অভাবনীয় ঘটনা! সম্মুখে আকাশ পথে আবির্ভূত হলেন উপবিষ্ট এক বিরাট মহাপুরুষের মূর্ত্তি, হাত দুটি জানুর উপর বিষয়ীমুদ্রায় স্থাপিত, গলায় দুলছে রুদ্রাক্ষের মালা, স্ফীত বক্ষদেশ, বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, তেজোদীপ্ত দুটি চোখ যেন পৃথিবীর সমস্ত আলো আর জ্যোতিঃ ধরে রেখেছে—তা'থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। প্রসন্নবদনে তিনি বামকরের তর্জ্জনী বাড়িয়ে শ্মশান, এক নদী ও পল্লীপথ দেখিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একি অদ্ভুত অত্যাশ্চার্য্য ঘটনা! এত আলো, এত জ্যোতিঃ অন্ধকারের বুক চিরে কোথা থেকে এল আর কোথায় বা মিলিয়ে গেল? তারানাথের সমস্ত শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হল! অনুভব করলেন এক দিব্যানুভূতি, এক অপার্থিব চেতনা শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে, কি অপূর্ব্ব শিহরণ! নির্ভীক হঠযোগী ধ্যানে বসলেন, উপলব্ধি করলেন ইনিই তাঁর ইষ্টদেবতা গুরু যিনি তারই জন্য অপেক্ষারত, যাঁর স্নেহচ্ছায়া নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে তাঁর জন্য ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে সুদূর বীরভূমে। এই দৈববাণীর পর ছায়ামূর্ত্তি দেখে তিনি কালবিলম্ব না করে কাশ্মীর রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলেন।

কাশ্মীর রাজদরবারে এসে মহারাজ সমীপে দৈববাণী ও অলৌকিক ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করলেন। এই দরবারে দু'জন পুতচরিত্র বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। একজন বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীমহেশ চন্দ্র বিশ্বাস আর অপরজন শ্রীগগন চন্দ্র বিশ্বাস, ইঞ্জিনিয়ার। ইনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশে তিব্বত অভিযানের জন্য টিহরীর পথ নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত। বাংলার এই দুই সন্তানও বাংলাদেশের বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তঃপাতী চণ্ডীপুর গ্রামে তারাপীঠের সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপা বাবার সাধনজীবনের এক অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করলেন। তাঁদের

কাছে বামাক্ষেপা ও জগজ্জননী তারামায়ের পরিচয় পেয়ে কাশ্মীর মহারাজ এই বিহ্বল সাধককে বীরভূম যাবার সুব্যবস্থা করে দিলেন। তারানাথও কালবিলম্ব না করে অস্থির হয়ে পড়লেন বীরভূমের দিকে লক্ষ্য রেখে যাত্রা করার জন্য।

॥ তিন ॥

তারাবিদ্যা সাধনা সম্বন্ধে রুদ্রযামলের ১৭শ পটলে ও ব্রহ্ম যামলের ১ম ও ২য় পটলে মহর্ষি বশিষ্ঠের তারা-মহাবিদ্যা সাধনের বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বারকায়াং পূর্ব্বতীরে শাল্মলী বৃক্ষভবেৎ।
তত্র যত্নেন গন্তব্যং যত্র তারা শীলাময়ী ॥
(শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ধৃত পীঠমালা)

পুনঃ তারারহস্যে বলা হয়েছে—

বক্রেশ্বরস্য ঐশান্যাং বৈদ্যনাথস্য পূর্ব্বতঃ।
তারাপুর মিতি খ্যাত নগরী ভূবি দুর্ল্লভং ॥

উত্তরবাহিনী দ্বারকা নদের পূর্ব্বতীরে প্রাচীন পীঠতীর্থ তারাপুর, শক্তিসাধনার পুণ্যক্ষেত্র। মাতৃভাবে সাধনায় কতশত শক্তিধর এখানে সাধনা করে পূর্ণকাম হয়েছেন; তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত পূর্ব্ব রেলওয়ের রামপুরহাট ষ্টেশন হতে পাঁচ মাইল পীচ্ ঢালা পথে বাস বা সাইকেল রিক্সায় চণ্ডীপুর গ্রামে পীঠস্থানে যাওয়া যায়। তন্ত্রে বলা হয়েছে, শক্তি সাধনার প্রশস্ত ক্ষেত্র হল শ্মশান। তারাপীঠের জীবন্ত শ্মশানের ইতিহাস বিশ্ববিশ্রুত। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এই পীঠস্থানে চীনাচারে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মানুষ-সৃষ্টির সংকল্পে ব্রহ্মা প্রথমে যে ক'জন মানসপুত্র সৃষ্টি করেন তাঁদের মধ্যে বশিষ্ঠ একজন। বশিষ্ঠদেবকে ব্রহ্মা বিবাহ করে স্বস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ ও প্রজাসৃষ্টির সহায়তা করার জন্য বলেন। বশিষ্ঠদেব সংসারী হতে অস্বীকার করায় পিতা ব্রহ্মা কুপিত হয়ে অভিশাপ দিলেন, তুমি দাসীপুত্র হয়ে জন্মাবে। অভিশাপ মোচনের

তারাপীঠ, বুদ্ধ বশিষ্ঠ কাহিনী ও বামদেবের পরিচয়

উপায়, তারামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কামাখ্যা-যোনিমণ্ডল তীর্থে তপস্যা করা। সেজন্য বশিষ্ঠ পিতার আদেশ মত নীলপর্ব্বতস্থ কামাখ্যা তীর্থে সহস্রবর্ষ হবিষ্যান্ন ভোজন করে তারাদেবীর আরাধনা করে কোন ফল না পাওয়ায় আরও একহাজার বৎসর প্রতিদিন এক গণ্ডুষ মাত্র জল পান করে সাধনা করেও দেবীকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম না হওয়ায় অবশেষে নিরাহারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তারামন্ত্র জপ করে আটহাজার বৎসর কাটিয়েও দেবীর করুণা লাভ করতে পারলেন না। এইভাবে দশহাজার বৎসর কামাখ্যা যোনীপীঠে পরমেশ্বরী তারার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে না পেরে, এবিদ্যা দুঃসাধ্য ভেবে অভিসম্পাত করেন—তারাবিদ্যায় এই তীর্থে কোন সাধক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করতে পারবে না। অভিশাপ শুনে কামাখ্যাদেবী বালিকার বেশ ধরে এসে বশিষ্ঠকে শান্ত করে শাপোদ্ধার করিয়ে বললেন, তারাবিদ্যার মতো ত্রিজগতে অন্য কোন বিদ্যা নেই। এই বিদ্যার বলে ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদ ব্যাখ্যা করেন। এই বিদ্যাবলে তত্ত্ব-জ্ঞানময় বিষ্ণু জগৎ পালন করেন। প্রলয়কালে দেবাদিদেব মহাদেব রুদ্র অখিল জগৎ সংহার করেন। আমি জীবকে সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ করি। তুমি এতকাল বৃথাই পরিশ্রম করেছ, তোমার পিতার নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্বস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ কর নাই, আমি চীনাচার ভিন্ন কখনই প্রসন্না হই না। আমার আরাধনার পদ্ধতি কেবল বুদ্ধরূপী বিষ্ণুই জানেন। তুমি অথর্ব্ব বেদানুগামী বৌদ্ধ দেশ মহাচীনে যাও। বশিষ্ঠ পুনরায় তপস্যায় বসলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না। অভিষ্টলাভে বিলম্বে অধীর হয়ে তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ করলেন। অকস্মাৎ দৈববাণী শুনে কৌতুহলী হয়ে ভাবলেন যার জন্য পিতা কর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হয়েছি, সেই সৃষ্টিধারা কেমনভাবে কোন পথে প্রবাহিত হচ্ছে একবার আমাকে তা দেখে আসতে হবে। এই বলে তিনি দেশভ্রমণে বের হলেন। একস্থানে দেখলেন, চীনবাসীরা মদ্যমাংসাদি পঞ্চ-'ম'-কারে

তারাদেবীর অর্চ্চনা করছে। এই দেখে বশিষ্ঠের মনে হল, ঘৃণ্য জঘন্য মদ্য মাংস দিয়ে কি কখনও দেবতার পূজা হয়? ইহা ঘোরতর অনাচার, ব্যাভিচার! চীনারা তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন, আপনি তপস্যার উপযুক্ত নন, আপনার কিছুমাত্র মনোবল নেই। আমাদের মনে হয়, পাছে আপনি প্রলোভনে পড়েন সে ভয়ে ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছিলেন আর আমরা এই সমস্ত ভোগের মধ্যেও কিরূপ জীবন যাপন করছি তা ভালভাবে না জেনে শুধু বাহ্য আচার দেখে আমাদের জাতির সম্বন্ধে একেবারে সিদ্ধান্ত করলেন যে আমরা অনাচারী? যাই হোক, আমরা আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি যে আপনি পরজন্মে দাসী-পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন আর এই আচারেই তারাদেবীর আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করবেন। বশিষ্ঠদেব ধীরে ধীরে চট্টলে চন্দ্রনাথ তীর্থে এসে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করলেন।

বীরভূম জেলার দ্বারকানদের তীরে কবিচন্দ্রপুরের অপরপারে চন্দ্রচূড় নামে রাজার রাজধানী ছিল। এখানে চন্দ্রচূড় নামে দেবাদিদেবের অনাদি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপরোক্ত রাজার রাণী তারাবতীর হারাবতী নামে এক দাসী ছিল। ইহার গর্ভে ও কুবুদ্ধ নামে এক চিরকুমার তপস্বীর ঔরসে হারাবতীর পুত্ররূপে অভিশপ্ত বশিষ্ঠদেবের জন্ম হয়। জাতিস্মর বশিষ্ঠদেব বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপের কথা স্মরণ হওয়ায় চীনদেশে গমন করেন। তিনি তিব্বতে মহাবুদ্ধরূপী ভগবান বিষ্ণুর দর্শন পান। বশিষ্ঠদেব দেখলেন, রূপযৌবনসম্পন্না মদ্যপানরতা শৃঙ্গাররসাবিষ্টা দেবীধ্যানপরায়ণা সহস্র রমণী পরিবেষ্টিত হয়ে বুদ্ধ বসে রয়েছেন। বুদ্ধের সঙ্গী সিদ্ধগণ সকলে দিগম্বর। এই দেখে বশিষ্ঠ হাত যোড় করে বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়ে বলেন, আমি বেদমার্গপরায়ণ, সিদ্ধিমার্গ জানি না। এখানে মদ্যপান মাংসভোজন ও স্ত্রী সেবনাদি দেখে বুঝতে পারছি না কি উপায়ে, কিরূপে সিদ্ধিলাভ হবে। উত্তরে

বুদ্ধরূপী বিষ্ণু বললেন, আমি তোমাকে উত্তম কৌলমার্গ উপদেশ দেব। তুমি একান্তমনে শ্রবণ কর। এই চীনাচারের বৈশিষ্ট্য, নিম্নস্তরের সাধকদের মত বিধি-নিষেধের অধীন হয়ে চলতে হয় না। সকল রকম বিকারের হেতুর মধ্যে থেকেও নির্ব্বিকার থাকতে হয়। এই সাধনায় স্নান শৌচ জপ তর্পণাদি সকলই মানসিকভাবে করতে হয়। এ সাধনায় সাধকের পক্ষে সকল কালই শুভ। অশুভ কাল বলে কিছু নেই। দিবারাত্র সন্ধ্যা নিশা বা মহানিশাতে আরাধনায় কোন পার্থক্য নেই। শুদ্ধি অশুদ্ধির অপেক্ষা নেই। পবিত্র অপবিত্র বিচার নেই, স্নান না করে আহার করেও দেবীর পূজা করতে পারা যায়। এ সাধনায় নারীকে কখনও দ্বেষ করতে নেই, তাঁকে বিশেষ-ভাবে পূজা করতে হয়। স্ত্রী-জাতিই শক্তি। সকল নারীই দেবী। অতঃপর চীনাচার সাধনা, পঞ্চ 'ম'-কার তত্ত্ব—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর মুখ-নির্গত বাণী তন্ত্রমতে তারাদেবীই ব্রহ্মময়ী—সগুণা, নির্গুণা, সাকারা নিরাকারা দ্বন্দ্বাতীতা, সর্ব্বভাবময়ী, কোটিসূর্য্যসম প্রভাবিশিষ্টা, কোটিচন্দ্রসম সুশীতলা, মহাকাল মহিষী স্থির-বিদ্যুৎ সদৃশী শুনে জ্যোতির্ম্ময়ীর তত্ত্ব উপলব্ধি করে তাঁর ভ্রম নিরসন হল। পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম, সব ত্যাগ করে এবং পূর্ব্বজন্মের অবস্থা ভেবে সংযত হয়ে বীরভূমে এসে এই তারাপীঠের মহাশ্মশানে শিমুলবৃক্ষ মূলে তারামায়ের প্রতীক 'দ্বিভূজাং দেবীং নাগযজ্ঞো-পবীতিনাম্ বামে শিবস্বরূপং তৎকল্পিতং বৎস্যরূপকম্' ধ্যানে একখানি ব্রহ্মশিলা স্থাপন করে যোগ সাধনা ও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। বশিষ্ঠের পর তারাপীঠ মহাশ্মশানে বহু সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। নাটোরের রাজযোগী সাধকপ্রবর মহারাজা রামকৃষ্ণ যখন সাধনার জন্য তারাপীঠে তখন আনন্দনাথ নামে জনৈক সাধক প্রধান কৌলপদে বৃত ছিলেন। এই আনন্দনাথই শাক্ত ও বৈষ্ণবের পীঠস্থান তারাপীঠে শাক্ত-বৈষ্ণবের বিরোধ দূর করেন। আনন্দনাথের পর

মোক্ষদানন্দ। মোক্ষদানন্দের সময় কৈলাসপতি ব্রজবাসী স্বস্ত্রীক এখানে সাধনা করতেন। এই কৈলাসপতি ব্রজবাসী ও মোক্ষদানন্দ মহাত্মা বামাক্ষেপার শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু ছিলেন। বামদেবের পর তাঁর অভিষিক্ত মন্ত্রশিষ্য তারাক্ষেপাও (ব্রহ্মচারী তারানাথ) গুরুর আসনে বসে তারাপীঠের মহিমাকে সর্মাধক সমুজ্জ্বল করেন। এরপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত আর উপরোক্ত সিদ্ধসাধক মহাত্মাদের ন্যায় উচ্চ তপঃশক্তিসম্পন্ন তপস্বী দেখতে পাওয়া যায় না। তারাপীঠকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ৫১ (একান্ন) পীঠের ৫টি পীঠস্থান ও বহু দেবালয় আছে। তারাপীঠ হতে ৪ মাইল দূরে একচক্রা গ্রামে বক রাক্ষসের আবাস ভূমি ছিল। এর একমাইল দূরে বীরচন্দ্রপুর বা গর্ভবাসএ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থান। এখানে তাঁহার জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবে শাক্ত ও বৈষ্ণব নির্ব্বিশেষে ভক্ত সাধক সকলে যোগদান করেন। এছাড়া উত্তরে কালীপীঠ, উদয়পুর, দক্ষিণে ঘটকালী, পূর্ব্বে মহাস্তুতলা পশ্চিমে বামাক্ষেপার জন্মস্থান পুণ্যভূমি 'অটলা গ্রাম'। সাঁইথিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট নন্দাদেবী, বোলপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কঙ্কালী মা, নলহাটিতে ললাটেশ্বরী, লাভপুরের ফুল্লরা মহাপীঠ, অট্টহাসে চামুণ্ডা প্রভৃতি সুপ্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রসাধনার স্থান রয়েছে।

আজকের তারাপীঠ আর সে তারাপীঠ নেই, তীর্থস্থান সহরে পরিণত হয়েছে। সেই শাল্মলী বৃক্ষও নাই, তবে তার স্থানে বশিষ্ঠ সিদ্ধাসন, তারপাশেই বামদেবের ও অন্যান্য সাধকদের সমাধি আছে। তারামায়ের পূর্ব্বের সে মন্দির নাই। বহু ঝড় ঝঞ্ঝা কত বিপ্লব হয়ে গেছে, কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। প্রাচীন মন্দির লুপ্ত হ'লে কতকাল পরে রত্নাগড়ের বণিক জয়দত্ত স্বপ্নাদেশ পেয়ে বশিষ্ঠদেবের আরাধিতা শিলামুর্ত্তি কৈত্তরের নালা থেকে উদ্ধার করে মন্দির নির্ম্মাণ করে তারামায়ের 'ব্রহ্মশীলাটি' প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তাহাও ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর ঢেকার (বীরভূমের) রাজা

রামজীবন দ্বারকানদের তীরবর্তী নিম্নভূমি ভরাট করে তারামার মন্দির ও ভৈরব চন্দ্রচূড়ের মন্দির নির্ম্মাণ করে দেন। নদীর ধ্বংসে এই মন্দিরও ধ্বংস হয়ে যায়। এই ভগ্নস্তূপের উপরই বঙ্গাব্দ ১২২৫ সালে দেবীর বর্ত্তমান মন্দির মল্লারপুর নিবাসী দানবীর স্বর্গীয় জগন্নাথ রায় তৈরী করে দেন। ইনি জাতিতে সদ্‌গোপ ছিলেন। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানী ও তাঁর সাধকপুত্র পুণ্যশ্লোক মহারাজা রামকৃষ্ণের ব্যবস্থাপনায় মন্দিরে নিত্যপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান অদ্যাপিও নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। পূজা ভোগারতি উৎসবাদি রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সেবাইতগণ পরিচালনা করেন। ইঁহাদের ব্যবহার অমায়িক, আত্মীয়ের ন্যায়। আজ আমরা যত তীর্থস্থান যত দেবদেবীর মন্দিরাদি যত চিন্ময়ভাব-প্রকাশক বিগ্রহ দেখতে পাই তা নিত্যাত্ত্যের দ্যোতক। এইসব তীর্থস্থান বিধ্বস্ত এবং মূর্ত্তিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হলেও ভারত বহু অর্থব্যায়ে পুনরায় কতবার গগনস্পর্শী মন্দির ও পাষাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে শাশ্বত ভাবরাশির বহির্বিকাশের চেষ্টা করেছে। নীলতন্ত্রে তারারহস্য বার্ত্তিকা, শিবশক্তি-সঙ্গম প্রভৃতি পুঁথিপত্রে দেখতে পাওয়া যায়, বশিষ্ঠদেবের চীনদেশে গমন ও বাংলাদেশে বৌদ্ধতন্ত্রমতে তারা, লোকেশ্বর বুদ্ধের সুতা ও তাঁর অপর নাম প্রজ্ঞা পারমিতার পূজা। ইহাকে কেহ কেহ নীল সরস্বতী, একজটা, কামতারা তারিণী উগ্রতারা প্রভৃতি নামেও অর্চ্চনা করেন। বামদেব বা বামাক্ষেপার পরিচয় আজ আর নূতন করে দেবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি সংক্ষেপে পরিচয় না দিলে তারাপীঠের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তারাপীঠের অপর পারে দেড়মাইল দূরে আটলা গ্রামে বঙ্গাব্দ ১২৪১ সালে শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে বামদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সর্ব্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বামাচরণের দুইটি ভগ্নী ও একটি ভ্রাতা ছিল। পল্লীর পাঠশালায় বামাচরণের অক্ষর পরিচয় হয়েছিল মাত্র। বাল্যকাল থেকেই প্রতিমা গড়ে পূজা, ফুল নৈবেদ্য দান,

মুখে ঢাক ঢোলের শব্দ করে নিত্যনতুন খেলা করতেন। বাল্যকালেই এঁর পিতৃবিয়োগ হয়। সংসারের অভাব অনটন কোনদিকেই এঁর ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তারামন্দিরে ও শ্মশানেই বেশীরভাগ সময় থাকতেন। তারাপীঠের কর্ম্মচারীগণ কয়েকবার ফুল তোলা, তাঁকে মন্দিরের টুকিটাকি কাজে নিযুক্ত করে তাঁহার মাতাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতেন। বামাচরণ নিশিদিন 'তারা' 'তারা' করেই কাটাতেন, কাজে মনযোগ দিতে পারতেন না। মাতৃহারা বালকের মত মা মা করে কাঁদতেন। সময় সময় গান করতেন—

পদ্মমধু আনরে মন, তারামায়ের চোখে দিব
মার হয়েছে দৃষ্টির অভাব, জলছানি তায় কাটবে।

এইসব দেখে শুনে তারাপীঠ-কৌল মোক্ষদানন্দ এবং পরে কৈলাসপতি ব্রজবাসীর শিক্ষায় দীক্ষায় বশিষ্ঠের সিদ্ধাসন অধিকার করেন। এই সাধকের পদপ্রান্তে এসে কত ব্যক্তি শান্তিলাভ করেন তার ইয়ত্তা নাই। তিনি (বামদেব) সুদূর হিমালয় থেকে নিজ আসনের ভাবী উত্তরাধিকারী জেনে বক্ষ্যমান গ্রন্থের আলোচ্য মহাত্মা তারাক্ষেপা বাবাকে আকর্ষণ করে আনেন। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য শিষ্যকে নির্দ্দেশ দান করেন। এরই নির্দ্দেশানুযায়ী সাধক তারাক্ষেপা স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগণ্য নায়করূপে দেখা দেন ও একাধিকবার কারাবরণ করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সজ্ঞানে দেহত্যাগের সময় বলেন, বুড়োমহারাজের (বামদেবের) প্রারব্ধ কর্ম্মের জন্য শতাধিক বৎসর জীবন ধারণ করেছিলাম, আমার কাজ শেষ।

পূর্ব্বে বলেছি, বশিষ্ঠদেবের আরাধিতা 'ব্রহ্মশিলা'ই তারামার প্রতীক স্বরূপ বর্তমান পাণ্ডারা পূজা করেন। এই শীলাতে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায় তাহাতে মায়ের কোলে শায়িত শিশুকে মা বাম স্তনটি পান করাচ্ছেন, ইহা মাতৃভাব ও বাৎসল্যভাবের অপূর্ব্ব দ্যোতক। পুরোহিত দক্ষিণ-মুখো বসে পূজা করেন। শ্যামায় শ্যামের পর্ব্বগুলি

পালিত হয়, আবার তারামায়ের রাস দোল ইত্যাদি উৎসবাদিও উদযাপিত হয়। এই সময় দোলমঞ্চতে মাকে রাখা হয়। আবার রথের সময় রথযাত্রাও আছে। মন্দিরের চত্বরের ভিতর চন্দ্রচূড় ভৈরবের মন্দির আছে, নাটমন্দিরের সামনেই। বণিকের মৃতপুত্র এখানে পুনর্জীবন লাভ করে।

॥ চার ॥

তরুণ যোগী তারানাথের এখন পূর্ণযৌবন। দীর্ঘকাল হিমালয়ের জলবায়ুতে শরীর সুদৃঢ়, সবল ও পরিপুষ্ট। সুবিস্তারিত বক্ষস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, চক্ষে অপূর্ব্বজ্যোতি, হাতে পরশু (কুঠার) ও দীর্ঘ যষ্টি, পায়ে পার্ব্বত্য পদত্রাণ, পরিধানে রেশমী বস্ত্র, গায়ে রেশমী পিরাণ, কাঁধে নিজের ব্যবহারের দ্রব্যসম্ভার। এইভাবে তিনি দ্রুতপদে পাঞ্জাবে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে পথে এক দুর্ঘটনা ঘটল। এক্কা গাড়ির ঘোড়া ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল, গাড়ী উল্টে তারানাথ মাটিতে পড়ে গিয়ে বুকে দারুণ আঘাত পেলেন। কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি আবার চলতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে হরিদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে কয়েকদিন থেকে তারপর দিল্লী যাত্রা করলেন। দিল্লীতে ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের বাড়ীতে এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এখানে চিকিৎসক দম্পতির সেবা ও পরিচর্য্যায় অল্পদিনে সুস্থ হয়ে উঠলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চমবার্ষিক রাজ্যোৎসবে ইন্দ্রপ্রস্থ-দিল্লী খুব সাড়ম্বর আয়োজন-মুখর হয়ে উঠেছিল। এই দরবারে তখন ভারতের বহু সামন্ত নরপতি রাজা মহারাজা জ্ঞানী গুণী এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ডাক্তার সেনও এই দরবারে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তারানাথকেও এই দরবার দেখার জন্য ডাক্তার সেন অনুরোধ করেন। সহসা তারানাথের কানে বার বার ধ্বনিত হতে থাকে এক অস্ফুট স্বরের প্রশ্ন, এই দরবার কি দেখবে? কে তুমি? কি তোমার প্রকৃত স্বরূপ? এর চেয়ে বড় দরবারে তোমার ডাক পড়েছে। সেখানে তোমাকে প্রয়োজন, শীঘ্র চলে এস। তারানাথও আর কালবিলম্ব না করে ডাক্তার দম্পতির নিকট হতে বিদায় নিয়ে রেলগাড়ীতে উঠে বাংলা অভিমুখে

বীরভূম যাত্রার পথে হরিদ্বার ও দিল্লী উপনীত

ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের আতিথ্য গ্রহণ

চললেন। কার্ত্তিকমাস, পথে তিনদিন অনাহার! তারানাথ কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে গন্তব্যস্থল তারাপীঠ অভিমুখে রওনা হলেন।

এদিকে বামদেবও তারানাথের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে পথ পানে তাকিয়ে আছেন। বামদেব সিদ্ধপুরুষ, সর্ব্বজ্ঞ। তিনি দিব্যদৃষ্টির অধিকারী। তিনি নিজ আসনের অধিকারীর আগমনের কথা পাণ্ডাদের বললেন, দাদা আসছেন। পাণ্ডারা তাঁর হেঁয়ালী—কে দাদা? কখন আসছেন? এসব কথা ঠিক বুঝতে পারলেন না। তারপর যেদিন তারানাথ আসবেন, সেদিন বামদেব পাণ্ডাদের পুনঃ বললেন, আজ দাদা আসবেন। সেইদিনই তারানাথ রামপুরহাটের আগের ষ্টেশন মল্লারপুরে গাড়ী থেকে নামলেন। সেখান থেকে পাঁচমাইল পদব্রজে এসে হাজির হলেন তারাপীঠ-চণ্ডীপুর। প্রথমে তারামায়ের মন্দিরে মাতৃমূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করে কালীপাণ্ডা নামে জনৈক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বামদেব কোথায়? তিনি পরশু হস্তে পরশুরাম-রূপী তারানাথকে দেখে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি একেবারে বামদেবের সামনে নিয়ে এলেন। তারানাথ গুরু বামদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হওয়ামাত্র প্রথম দর্শনেই বামদেব বললেন, দাদা এসেছেন? আমি কতই ভাবছিলাম। গুরু-শিষ্যে মিলন—সে এক অপূর্ব দৃশ্য, ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তারানাথও বাঞ্ছিত গুরু বামদেবকে একাধারে প্রভু, পিতা, প্রিয়সখা, শিব ও তারামাকে পেয়ে পরমানন্দে গুরুপদ বন্দনা করলেন। নিকটে শ্মশানে ধ্যানাবস্থিত-চিত্ত সাধক চতুর্দ্দিক ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করে গেয়ে চলেছেন—

গুরুশিষ্যের অপূর্ব্ব মিলন গুরু বন্দনায় বিভোর

কি চিন্তা কর রে মন, নিশ্চিন্তে বসিয়া থাক,
গুরুব্রহ্ম জগৎজোড়া, প্রাণ ভরে তারে ডাকো।
হৃদয় মাঝে আছে বিন্দু,
চিদাকাশে ফুটাও ইন্দু,
নয়নে নয়ন মেলিয়া দেখ॥

দেহ মন উৎসর্গ করি, বসিয়া দিবস শর্বরি,
সিদ্ধাসিদ্ধ এক করি, গুরুপদে প্রাণ সপ ॥

গুরুও প্রথম দৃষ্টিপাতে শিষ্যকে পুত্রপদে বরণ করলেন। পরক্ষণেই বামে সদানন্দময়ী তারামাকে দেখে শিষ্যের মুখ থেকে তারা স্তোত্র[৩] অনর্গল নির্গত হতে লাগল। বাল ব্রহ্মচারী, দীর্ঘকেশ, আজানুলম্বিত বাহু, তেজস্বী স্থিরযৌবন তারানাথ গুরুকে সম্বোধন করে বললেন, কর্ত্তা! আমায় ডেকেছেন কেন? গুরু বাম অনুভব মুদ্রায় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বললেন, আজ নয়, কাল নয়, পরশুও নয়; তিনদিন পরে আপনার জন্মদিন—সেই দিনই বোঝাপড়া হবে কেন ডেকেছি।

গুরুর চরণ ও গুরুপদে আত্মসমর্পণ

পরম সমাদরে গুরু বামদেব তারানাথকে বললেন, দাদা! আপনি ক'দিন উপবাসী আছেন, কিছু সিদ্ধ ছোলা ও মুড়ি খান। তারানাথ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। তৎসত্ত্বেও গুরুর আদেশে ইহা আহার করলেন। শিষ্য ছিলেন যেমন অদ্বিতীয়, গুরুও ছিলেন তেমনি অসাধারণ। শিষ্য সর্ব্বদা পরমানন্দে ব্রহ্মরসে অভিভূত থাকতেন। ত্রিকালদর্শী বামদেবের চরণপ্রান্তে প্রণাম করে নিজের জ্ঞান গর্ব্ব, মান অভিমান, বিচার বুদ্ধি সব ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করলেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, আমাতে আত্মসমর্পণ কর, আমি তোমাকে সংসারদশার সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার করব। তুমি জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাত ও অকৃত্রিম সেবা করে সন্তুষ্ট কর, তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন কর, তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন। তারানাথ আহারের পর গুরুসেবা ও দেহ কৃত্যে দিবাভাগ কাটিয়ে দিলেন।

এই দিনই তারাপীঠে কয়েকজন ভৈরব ও ভৈরবী[৪] এসেছিলেন। তাঁদের অনুরোধে বামদেব রাত্রে শিমুলতলায় তারানাথকে নিয়ে নিশাকালে চক্রানুষ্ঠানে[৫] চক্রেশ্বর পদ স্বীকার করেন। এই অনুষ্ঠানে তারানাথের তারাপ্রেমের তরঙ্গ উঠল! তারানাথ এই প্রথম তন্ত্রাচার

দেখলেন। অনুষ্ঠান শেষে রাত্রে যখন ভৈরব ভৈরবীগণ নিদ্রিত হয়ে পড়লেন, বামদেব তখন পুত্রসম প্রিয় শিষ্যকে গভীর নিশায় মহাশ্মশানে নিয়ে গেলেন। সেদিন ছিল কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। শিষ্য হঠযোগী। তেজস্বী দৃঢ়কায় অকুতোভয়, ভয় কাকে বলে তা তিনি জানেন না। নির্জ্জন হিমাচলে কৈশোর থেকে বিচরণ করছেন। তারাপীঠ ত সে তুলনায় লোকবসতিপূর্ণ স্থান। এখানকার শ্মশানে আর কি ভয়? শবভূমিতে পদার্পণ করতেই তাঁর সামনে একটা চিতা জ্বলে উঠল—জ্বলন্ত চিতার মধ্যে তারামূর্ত্তি, সঙ্গে সঙ্গে শত শত হাতীর তুমুল বৃংহণধ্বনি। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কর্ত্তা, এসব কি আপনার খেলা, ঐশ্বর্য্য? নিরভিমান ভক্তবৎসল গুরু উত্তর দিলেন, এ তারামায়ের রাজ্য, এসব মায়ের ঐশ্বর্য্য।

শিষ্য-অভিষেকের পালা, তন্ত্রাচার ও তন্ত্রোক্ত চক্রানুষ্ঠান

পরদিন অমাবস্যা—তায় সূর্য্যগ্রহণ। তারানাথের ইচ্ছা বা মনোভাব উপবাসাদি করে জপধ্যান করেন। হঠযোগী তিনি, বিধি নিষেধের অধীন। এ সুযোগ ছাড়বেন কেন? গুরু বামদেব রাজযোগী, সিদ্ধপুরুষ এবং সকল বিধি-নিষেধের ঊর্দ্ধে। তাঁর বাহ্যানুষ্ঠান কিছুই নেই। তারানাথকে সুদূর হিমাচল থেকে টেনে এনেছেন এই ধারার সাধনায় অধিকার দেবার জন্য। তিনি শিষ্যকে বললেন, দাদা! আজ মাংস ও ঘনবর্ত্ত দুধের পরমান্ন (পায়স) খাব। শিষ্যেরও বিধি-নিষেধের গণ্ডী রাখবেন না, তাকেও এর ভাগ প্রসাদ নিতে হবে। গুরুর আদেশে শিষ্য মাংসাদি পাক করলেন। আহারের সময় উপস্থিত হলে গুরু আহার্য্য বস্তু মাংসাদি আনতে বললেন। শিষ্য মাংস ও ঘনবর্ত্ত দুধের পায়স এনে গুরুকে আহার করতে দিলেন। গুরু তৃপ্তির সহিত আহার করে শিষ্যকে আদর করে বললেন, দাদা! প্রসাদ গ্রহণ করেন। শিষ্য গুরুদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করার সময় বললেন, কর্ত্তা! আপনার সবই বিপরীত।

শিষ্যের বিধি-নিষেধ ভঙ্গ ও কৌল-ধর্ম্মে দীক্ষা

গুরু বললেন, হ্যাঁ দাদা! এ যে শিমূলতলা, তারা মা যে বামা। গুরুপরম্পরায় কৌলাচারই এই কৌলতীর্থের উপযোগী। শিষ্য বললেন, মানুষকে পিশাচে পেলে সত্য বর্জ্জিত হয়। উত্তরে খড়্গ দেখিয়ে বললেন গুরু বাম—ইনিই গুরু, দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব সকলেই ইহার উপাসক। ইহাই ব্রহ্মদণ্ড, এর দ্বারাই পিশাচ মোচন হয়। খড়্গ মহেশ্বরের প্রাণ, রোহিনী এর উৎপত্তি স্থান, রুদ্রদেব তার গুরু। শিষ্য বুঝলেন, বামই দ্বিতীয় মহেশ।

শিমূলতলা কৌলাচারের তীর্থক্ষেত্র

খড়্গ উৎপত্তি বিষয়

অমাবস্যা, তায় সূর্য্যগ্রহণ, বাহ্যতঃ নিয়মভঙ্গ পালিত হল। গুরুবর শিষ্যকে কৌলধর্ম্মে দীক্ষিত করে রাতে তাকে সঙ্গে নিয়ে শবসাধনা করতে গেলেন। রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, শ্মশান জনমানবশূন্য। শেয়াল কুকুর অস্থিচর্ব্বনে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে কুকুরের চিৎকারে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে! কখনও বা শকুনি গাছের উপরে বসে হৃদয়-বিদারক ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে আর্ত্তনাদ করছে। তার উপর প্যাঁচার গুরুগম্ভীর রব। নরকরোটিগুলির মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবেশ করায়, বায়ু বাহির হবার সময় বিকট শব্দ হচ্ছে! অশরীর প্রেতযোনীগুলির ছায়ামূর্ত্তিসমূহ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে! কখনও বা চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মূর্ত্তিগুলি শ্যাওড়া গাছে উঠে যাচ্ছে! শিষ্য নির্ভীক, কেবল গুরুধ্যানে বিভোর—চারিদিকে লক্ষ লক্ষ নরকঙ্কাল মাটিতে পড়ে রয়েছে। কত যে বিগলিত শবদেহ! শৃগাল কুকুর হিংস্র জন্তুগুলি শব নিয়ে টানাটানি করছে—দ্বারকা কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে। বামদেব ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলেন—

শব করে এই দেহখানা, দেখবি শিবে শবাসনা,
বিপরীতে থাকবে রতি, মন হবে না আনমনা।
নিঠুর খেলা ছেড়ে মায়া, ব্রহ্মে গিয়ে হবে ছায়া,
দেহীর উপর দেখে কায়া, আত্মরমণ ছাড়বি না॥

গুরু শিষ্যকে শবের বুকে পদ্মাসনে বসিয়ে, শিষ্যের দেহখানিকে শবের মত জড়বৎ করে শিষ্যের সূক্ষ্ম দেহকে আজ্ঞাচক্রের উপর স্থিত ও নিরালম্ব পুরীতে উত্থিত করে রুদ্রগ্রন্থী ভেদ করে উচ্চতর সাধন-ক্রিয়ায় নিয়োজিত করলেন। শিষ্যও ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ হলেন। শিষ্য বুঝতে পারলেন, তাঁর ভিতরে শক্তিসঞ্চার হয়েছে। অন্তরের গভীরতর প্রদেশ থেকে শিষ্য গদগদ স্বরে গেয়ে উঠলেন—

মহানিশায় শব সাধনায় দ্বারা নব শক্তি সঞ্চার

শ্মশান ভালবাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।
আর কিছু নাই মা চিতে, চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে একবার এসে দেখিস্ যদি॥

পরদিবস, প্রতিপদ। সারাদিনরাত শিষ্য যোগনিদ্রাভিভূত হয়ে রইলেন। দ্বিতীয়ার দিন খুব ভোরে উঠে তারানাথ প্রাতঃকৃত্য সেরে পূজার জন্য ফুল তুলে আনলেন। গুরু শিষ্যকে বললেন, দাদা, বিল বেড়িয়ে এলাম। দক্ষিণ মশানে অনেক কাঠ পড়ে আছে, নিয়ে আসুন আগুন জ্বালাতে হবে। আজ যে আপনার জন্মদিন—সংস্কার করতে হবে যে। তারানাথ দ্বারকা নদের তীরে শ্মশানে শব দাহ করার পর যে কাঠগুলি পড়ে থাকে তা আনতে গেলেন। হাতে একখানা, কাঁধে একখানা, বগলে একখানা—তিন চারখানা কাঠ নিয়ে ফেরার পথে দেখলেন একটা বিরাট বিষধর সাপ বাঁদিক থেকে এসে তাঁর দক্ষিণ দিকে স্থিরভাবে ফণা তুলে দাঁড়াল। উভয়ে উভয়কে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। তারানাথের মনে হল তারামা-ই তাঁর নাগ-ভূষণকে পাঠিয়েছেন। শিমূলতলায় ফিরে এসে গুরুর কাছে এই ঘটনার বিষয় বললেন। গুরু অন্তর্যামী। তিনি বললেন, তোমার ঐ নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করে সাধনার পথ পরিষ্কার করে নিতে হবে।

প্রতিপদ তিথিতে স্বগৃহে গৃহদেবতার মন্ত্র শোধন করে শিষ্যকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান

শিমূলতলায়* সেই সংগৃহীত কাঠে হোমাগ্নি জ্বলে উঠল, উভয়ে আগুনের সামনে বসলেন। গুরুর মুখ অগ্নিকোণে, শিষ্যের মুখ বায়ুকোণে—চক্রানুষ্ঠান হ'ল। তারানাথ কিশোর বয়সে যে মন্ত্র পেয়েছিলেন গুরু তা প্রকাশ করে তা থেকে পঞ্চাক্ষর বাদ দিয়ে এয়োদশাক্ষর রাখলেন। গুরু দক্ষিণাস্বরূপ শিষ্যের যষ্টিটি চেয়ে নিলেন। ঐদিন ছিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—আদিত্যবার। গুরু বার বার বললেন, স্নান করে এসে পূর্ণকুম্ভে আদিত্যের উপাসনা কর। শিষ্যও কেউ কেটা নন। গুরুদত্ত মন্ত্র পরীক্ষা করলেন। গুরু-শিষ্যে অপূর্ব্ব আলোচনা। গুরু বললেন, কেমন রে কেমন? শিষ্য বললেন, হ্যাঁ-রে, হ্যাঁ। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, অপরে কি বুঝবে—সমস্যা সমান। শিষ্যও অসাধারণ, মহাপুরুষত্ব লাভ করেছেন। অভিষেকের পর ব্রহ্মচারী তারানাথ সজ্ঞান স্থিতপ্রজ্ঞ শাক্তবাদের সাহায্যে জীবনের আস্তিক্যবাদী স্বরূপ উপলব্ধি করলেন।

গুরু শিষ্যের পিতৃদত্ত নাম প্রমথেশ বদলে দিয়ে নূতন নাম রাখলেন, ব্রহ্মচারী তারানাথ। সেই থেকে সাধারণে তাঁকে 'তারাক্ষেপা' বলতেন। তারপর থেকে এই নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত। তারানাথ ছিলেন গুরুভক্তির আদর্শ। তারানাথের গুরু ও ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি দশরথের সহিত তুলিত হতে পারে। রাজা দশরথ বলেছিলেন, ত্র্যম্বক ভিন্ন আমি কাহারও উপাসনা করিনা। তারানাথ বামদেব ভিন্ন চতুর্দ্দশ ভুবনে কাহাকেও মানতেন না, কাহারও নিকট মাথাও নোয়াতেন না। তিনি বলতেন, বামদেবের কাছে মাথা বেচেছি, আর কার কাছে আবার মাথা নোয়াবো? গুরুও শিষ্যকে অভিন্ন ভেবে প্রাণঢালা ভালবাসতেন। সোনা যেমন পুড়িয়ে খাঁটি করা হয় তদ্রূপ গুরুও শিষ্যকে নির্ভীক জেনেও কঠোরভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শিষ্যকে আদেশ করলেন, আগুন জ্বেলে অগ্নি-পরিবেষ্টিত হয়ে উনিশ দিন তপঃসাধনা করতে। শিষ্য হঠযোগী,

গুরু কর্তৃক শিষ্যের অধ্যাত্ম জীবনের নামকরণ

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে নির্দ্দেশানুযায়ী উনিশ দিন দুঃসহ অতিক্লেশকর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-বেষ্টিত হয়ে আত্ম-নিগ্রহপূর্ব্বক তপস্বীব্রত উৎযাপন করেন। তপস্বী তারানাথকে এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, মানুষের সাধ্য কি সকল ভ্রম নাশ করে, জ্ঞান প্রকাশ করে। অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কারোও ক্ষমতা নেই যে স্থুল দেহকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধ করে নেয়। একমাত্র যিনি পারেন, তিনি গুরুব্রহ্ম—জো জানে অগ্নি ব্রহ্ম কা ভেদ, সোই ঈশ্বর সোই দেব। পিতা বামই সেই পুরুষ যিনি অগ্নিসম পরমব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা। তিনি ভিন্ন শুদ্ধ সৎ করে নিতে, পথ দেখাতে আর কে পারেন?

কৌলের অবস্থাই মুক্তির চরম অবস্থা। একত্বের জ্ঞানই মুক্তিলাভ। সকল জীবই মায়ামুগ্ধ, সকলেই ব্রহ্মাংশ। অগ্নি হতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হতে জীবের আবির্ভাব। কৌল হতে হলে সর্ব্বত্যাগী হয়ে তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সাধনা করতে হয়। যতদিন না তত্ত্বজ্ঞান হয় ততদিন ক্রিয়াকাণ্ড ও বিধি-নিষেধের প্রয়োজন। বামদেব যে তারানাথকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন তাও স্নেহ সম্ভ্রম জড়িত; শিষ্যও গুরু ইষ্টমন্ত্র এবং শিব অভেদজ্ঞানে বামদেবকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। গুরু বীর সন্তানকে গুরু-বিষয় জানাতেন, শিষ্যও সঙ্গে সঙ্গে গুরু-বিষয়ে আলোচনা করতেন। এভাবে তাঁদের পরস্পর প্রসঙ্গ আলোচনা চলত।

গুরু-শিষ্য বহুদিন একসঙ্গে সাধন ভজন, শবসাধনা করেছেন। এসময় শিষ্য তারানাথকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শেখান। শুষ্ক তুলসী গাছকে 'তুলসী জীও' মন্ত্র দ্বারা এই বিদ্যা কৈলাসপতি ব্রজবাসী বাবা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারানাথের গুরুভক্তি, গুরুস্থানের প্রতি এত গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল যে তিনি কখনও রামপুরহাট থেকে তারাপুর গরুর গাড়ী চেপে যাতায়াত করেন নি, পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বামদেব শিষ্যকে

তারাপীঠে সাধনারত ক্ষ্যাপাজী তারানাথ।

তারাপীঠের শিমুলতলায় বশিষ্ঠাসন
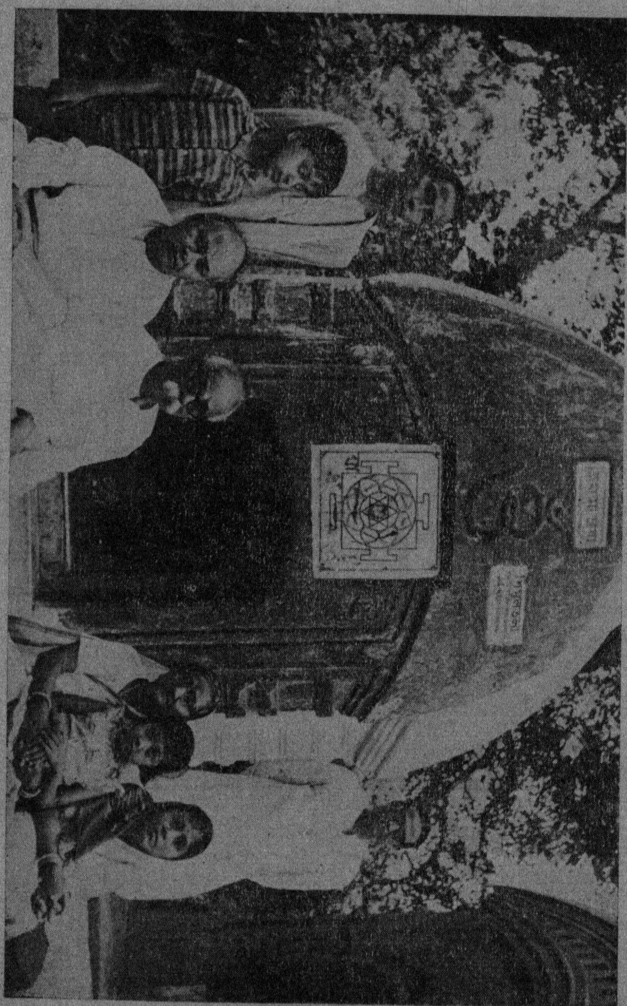
রামপুরহাটে পরলোকগত অধ্যাপক শ্রীজীতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পাঠালেন। সেখানে পৌঁছানর পরই জীতেনবাবুর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শেষ হবার পর গুরুর আকর্ষণ অনুভব করলেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কালবিলম্ব না করে তারাপীঠের দিকে যাত্রা করলেন। তারাপীঠ পদব্রজে সাত মাইল পথ। পথে দুটি নদী—চিলি ও দ্বারকা পার হতেই আকাশ ও চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি সরলপুরের মাঠে দিশেহারা হয়ে পথ হারিয়ে ফেললেন। এদিকে গুরু বামদেবও পাণ্ডাদের বলতে লাগলেন, দাদা আসছেন ; তাঁকে পিশাচে গিলতে চেষ্টা করছে। পাণ্ডারা এ হেঁয়ালী কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরেই শিষ্য তারানাথ এসে হাজির। বামদেব শিষ্যকে স্নেহভরে কাছে ডেকে নিয়ে পিশাচের কথা বললেন। শিষ্য বললেন, হ্যাঁ কর্ত্তা! এ ত তোমারই খেলা! শিষ্যের তেজবীর্য্য এরূপে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করে উপযুক্ত পাত্র বুঝে গুহ্যবিদ্যা ও নানাবিধ তত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগলেন। এদিকে শিষ্যও বিপুল শক্তির অধিকারী। তিনি বিভূতি দেখিয়ে ধনমানের প্রার্থী নন। তাই গুরু তাঁকে মহাবিদ্যার অধিকারী জেনে সিদ্ধ মহাবিদ্যা দান করেন।

তারানাথের তেজস্বিতার পরিচয় বহু বিষয়ে পাওয়া যায়। তিনি অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না, ভয় কাকেও করতেন না। একবার দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং গদী পাবার পরই ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। এই সময় তিনি সদলবলে তারাপীঠে আসেন। শ্মশানে ভৈরব বামদেব ও তারামাকে প্রসন্ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। শিমুলতলায় বশিষ্ঠদেবের আসনের বেদীতে জপ করার জন্য বেদীটি কানাৎ দিয়ে ঘিরে ফেললেন। তাই না দেখে, তারানাথ মহারাজকে বজ্রনির্ঘোষে বলে চল্লেন, শিমুলতলা তোমার দ্বারভাঙ্গার গদী নয়, এখানে সকল ভক্ত সাধকের জপ ধ্যান

করার সমান অধিকার। অপরের অসুবিধা সৃষ্টি করার তোমার কোন অধিকার নেই, কানাৎ উঠাও। মহারাজ তারানাথের পরশুরামের ন্যায় পরশু (কুঠার) হাতে উগ্র রুদ্রমূর্ত্তি দেখে তৎক্ষণাৎ কানাৎ তুলে দিতে বাধ্য হলেন।

এখানে একটি কাহিনী বলছি। তারানাথের গুরুভক্তি ছিল অগাধ ও অসীম। একবার কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ছোট রাজা সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের জামাতা বেনীমাধব মুখোপাধ্যায় স্বস্ত্রীক বামদেবের কৃপাপ্রার্থী হয়ে তারাপীঠে আসেন। রাজকুমারী বামদেবকে গুরুরূপে বরণ করেন। তিনি বামদেবের পা দুখানি ধুয়ে নিজের আঁচলে মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। শিষ্য তারানাথ তাই না দেখে তাঁর হাত থেকে গুরুর পা দুখানি নিজের দীর্ঘ কেশ দিয়ে মোছাতে মোছাতে বললেন, এভাবে গুরুসেবা করতে হয়—সোহাগ সঞ্চিত উষ্ণ আঁখিজলে ধোয়াব চরণ, মুছাব কুন্তলে। গুরু শিষ্যের ভাব দেখে বললেন, দাদা! আপনি কামরূপ জয় করতে কামাখ্যায় যান। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে ১৩১৭ সালে কামরূপ গিয়ে তিনি কামবীজের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ১৩১৮ সালে হঠাৎ একদিন তাঁকে কে যেন স্পর্শ করে বললেন, তুমি কি করছো, আমি চললাম, তুমি চলে এসো। চমক ভাঙ্গতে মুখ ফিরিয়ে ঘুরেই দেখলেন, নিজ গুরু বামদেবকে! আর কালবিলম্ব না করে সেই দিনই তারাপীঠ অভিমুখে যাত্রা করলেন। এর তিন দিন পরেই বামদেব দেহরক্ষা করেন।

॥ পাঁচ ॥

বামদেবের কোন ভৈরবী বা সাধন-সঙ্গিনী ছিল না, তারানাথেরও নয়। ১৯২১ সালে তারাপীঠে তেজোদীপ্তা, জ্যোতির্ম্ময়ী, দীর্ঘকেশী, অপূর্ব্বসুন্দরী এক যুবতী ব্রহ্মচারিণী তারানাথবাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসেন। সে সময়ে আমরাও কয়েকজন তারানাথ বাবার সঙ্গে তারাপীঠে যাই। তিনদিন এই যোগিনী মাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তন্ত্রের অনেক গুহ্য বিষয় সাধকপ্রবর তারানাথের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আমাদেরও কিছু কিছু শিক্ষা দেন। আমাদের মধ্যে কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় অবস্থিত 'দি লিলি এণ্ড কোম্পানী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তিনি তারানাথবাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইনি কি কামাখ্যায় আপনার সাধন-সঙ্গিনী ভৈরবী ছিলেন? তারানাথবাবা উত্তরে বলেছিলেন, শুনিস্ নি কি বুড়োজী মহারাজেরও কোন বাহ্য ভৈরবী ছিল না—তিনি অন্তর্মৈথুনশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, তারামাই আশ্চর্য্য ভৈরবী। জড়-প্রকৃতির মূলতত্ত্বই জগতের মাতৃযোনিত্ব। আমি সেই জগৎযোনি প্রধান সংজ্ঞক ব্রহ্মে গর্ভ আধান করি, তাতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। পরাপ্রকৃতির জড় প্রভাবই ঐ ব্রহ্ম। তাতেই ঐ পরাপ্রকৃতির তটস্থ প্রভাবগত জীবরূপ বীর্য্য আধান করি—তা থেকেই সকল জীবের জন্ম হয়। ব্রহ্মরূপা যোনিই সেই সকলের মাতা, আর কারণ চৈতন্যবিগ্রহ স্বরূপ আমিই সে সকলের বীজপ্রদা পিতা। আমার আবার ভৈরবীর প্রয়োজন কিরে?

আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৯৪২ সালে আমি নেপালের কর্নেল ভুপাল সামসের জঙ্গ বাহাদুরের গৃহচিকিৎসক থাকাকালীন কামাখ্যায় নেপালের লালমোহরার পাণ্ডার বাড়ী যাই। একদিন সেখানে

এই ব্রহ্মচারিণী মাতাজীকে দেখি। তাঁর সেই একই ভাব—যেন ৩০।৩২ বৎসরের যুবতী! আমায় পুত্রবৎ স্নেহচুম্বন করে তারানাথ বাবার সংবাদ লন। শুনেছিলাম, ইহাঁর বয়স ৭০।৮০ বৎসর। কখনো চন্দ্রনাথ, কখনো কামাখ্যা পীঠে থাকেন। সাধনজীবনে তারানাথবাবা আর একজন মহাতপস্বিনী মাতার সঙ্গলাভ করেন। তিনি ছিলেন হিন্দু ভারতের স্বপ্নদ্রষ্ট্রী ঋষিতনয়া—পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে বীরাঙ্গনা স্বরাজনেত্রী, ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিতা মহাতপস্বিনী মাতাজী গঙ্গাবাঈ। চিরকুমারী থাকবার সংকল্প নিয়ে পঞ্চাগ্নিব্রত পালন করেন। তারানাথবাবাও অগস্ত্যকূট পর্ব্বতে কন্দমূল খেয়ে বহুদিন একত্রে থেকে ইঁহার কাছ থেকে 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' শিক্ষা করেন। এর পরেও একসঙ্গে অনেকদিন সাধনা করেছিলেন। নদীয়া জেলার জুড়নপুর কালীঘাট তীর্থ কাটোয়া হতে চার মাইল। এখানে শ্মশানে একান্নপীঠের একপীঠ—দেবী জয়দুর্গা; ভৈরব ক্রোধীশ আছেন। শুনেছি, মাতাজী বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করতেন। তিনি বাংলাদেশে (অবিভক্ত বঙ্গদেশ) যখন আসেন তখন বাংলা বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্ম্মে অগ্নিগর্ভা। স্বরাজ সাধনায় সেই সময় দেশনেতৃগণ প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, বাঘা যতীন, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, মতিলাল রায়, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বালগঙ্গাধর তিলক, সাধক তারাক্ষেপা প্রভৃতি বিশিষ্ট দেশনেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক কারণে যুক্ত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মমুক্তির সাধনা, ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার পাবনী প্রবাহও অব্যাহত ছিল। কলিকাতায় থাকার সময় প্রায়শঃ নদীয়া জেলার পলাশীর নিকটে জুড়নপুরের শ্মশানে গিয়ে তপস্যা-মগ্ন থাকতেন মাতাজী গঙ্গাবাঈ।

মহাতপস্বিনী এই মাতাজী সম্বন্ধে বিশদালোচনা (১) গঙ্গা-বাঈ (মাতাজী)—ধর্ম্মানন্দ ভারতী, জন্মভূমি: ভাদ্র, ১৩১৫ (২)

মাতাজী গঙ্গাবাঈ (জীবনী পুস্তিকা ১৩৭৪)—অজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (৩) মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী—যোগেশচন্দ্র বাগল: আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল (৪) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় ১৫ই বৈশাখ (১৩১৪) সংখ্যায় উক্ত ব্রহ্মবান্ধব বিরচিত মাতাজীর জীবন-কাহিনী (৫) স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (৬) The Indian Mirror (Story Notes) 9th Sept. 1904. (৭) শ্রীশ্রীদয়াল মহারাজের অনুধ্যান: শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়: পথের আলো—১৪ই ও ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭ (৮) বামা-বোধিনী: বৈশাখ, ১৩১৪ (৯) মহাতপস্বিনী মাতাজী গঙ্গাবাঈ—হারাধন দত্ত: পথের আলো: ২৪শে ও ৩১শে আষাঢ় (১৩৭৭) দ্রষ্টব্য।

জুড়নপুর নিবাসী ৺হরিপদ মৈত্রের বৃদ্ধা স্ত্রীর কাছেও শুনেছি, গুরুর আদেশেই পলাশী ক্ষেত্রে সাধনা করতেন তারানাথবাবা। ঝাঁন্সী রাণীর দেহরক্ষী বলদেও সিং ও মাতাজী গঙ্গাবাঈ এখানে এসে সাধনা করে গেছেন। তারাপীঠের পরলোকগত পাণ্ডা তন্ত্র-বেদ-বেদান্ত, জ্যোতিষ, তন্ত্রবিজ্ঞান পুরাণাদি বিবিধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞ, তান্ত্রিক ও বৈদিক ক্রিয়াদি সিদ্ধ এবং বামদেবের সুদীর্ঘকাল সাধনসঙ্গী ও স্নেহধন্য পরমশ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথপাণ্ডা মহোদয় বলতেন, তারানাথবাবা উগ্রতাপস ও মহাযোগী ছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে (কখনও নিজেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে) গঙ্গা পার হয়ে যেতেন। একই রাত্রে তারাপীঠ থেকে জুড়নপুর শ্মশানে যাতায়াত করতেন। একদিন তারানাথবাবাকে খড়ে নদী (কৃষ্ণনগরে) পার হবার সময় মনে হ'ল একসঙ্গে নৌকায় উঠলাম কিন্তু ওপারে নৌকা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি তারানাথবাবা ওপারের তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বললেন না, হাঁ হাঁ করে অন্য কথা বলতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তারানাথবাবার একনিষ্ঠ

গুরুর আদেশে পলাশী ক্ষেত্রে জুড়নপুরে সাধন

ভক্ত চিরকুমার স্বর্গীয় ব্রজহরি মিত্র মহাশয়কে ক্ষিতি (ভূতত্ত্ব), অপ, মরুৎ, তেজ, ব্যোম তত্ত্ব সম্বন্ধে বলবার সময় বলেছিলেন, মূলাধারে ভূতত্ত্বের স্থান, আমাদের দেহের ভারকেন্দ্র। তাই এইস্থানে পৃথিবীর আকর্ষণ আমাদের দেহের ওপর মাথাই কাজ করে, আর সেইজন্য দেহের গুরুত্ব। আবার এই ভারকেন্দ্রকে আশ্রয় করে নীচের দিকে একটা টান যথেষ্ট মাত্রায় সৃষ্টি করতে পারলেই পৃথ্বিতত্ত্বের জয় হয়ে গেল। এই পৃথ্বিতত্ত্বের জয়ের তাৎপর্যই হল দেহের গুরুভার প্রতিষেধ—দেহে আর গুরুভার থাকে না। মূলাধার যেমন পৃথ্বিতত্ত্বের স্থান, নাভিদেশ (মণিপুর) তেমনি তেজঃতত্ত্বের স্থান। মূলাধার থেকে উপর দিকে একটা তেজস্ শক্তি প্রবাহ হয়। এই উর্দ্ধবাহিনী শক্তিধারাকে বিদ্যুন্মালার কল্যাণে দেহের গুরুত্ব অপহৃত হয়ে শুধু যে আকাশে উর্দ্ধগতি হতে পারে এমন নয়, ইহা ব্রহ্মদ্বারের খিল বা অর্গল মোচন করে জীবের ভোগাপবর্গ লাভের নিমিত্ত হয়।

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য গুরুনির্দেশ পালনের জন্য রাজনীতিতে মুখ্যভাবে প্রবেশ

যখন ভারত বিশেষতঃ বাংলাদেশ অনাচার ও ব্যাভিচারদুষ্ট, গুরু শিষ্যকে আদেশ করলেন, বাংলা তথা সারা ভারতভূমি সংস্কার ও ভারতের হৃতরাজ্য উদ্ধার কাজে তোমাকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সাধনভূমি শুদ্ধ করতে হবে, মাটি মা ব্যাভিচারিণী হয়েছে, পলাশী ক্ষেত্রে যাও। হেঁয়ালীতে বলেছিলেন, পলাশীর সেই পরাডাকিনীকে চিৎ করতে হবে। এই পরাডাকিনী শক্তি কাটোয়ার ঘাটে লর্ড্ ক্লাইভের হাতেই ভারতমাতাকে তুলে দিয়েছিল।

॥ ছয় ॥

এই পলাশীতেই জুড়নপুর কালীবাড়ী—দেবীর (দক্ষরাজ কন্যা সতী) একান্ন পীঠের অন্যতম অঙ্গপীঠ। এখানে কালীঘাটে দেবীর মুণ্ড পড়েছিল। দেবী মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরব ক্রোধীশ। এখানে দেবীর কোন মূর্ত্তি নেই। কাটোয়ার গঙ্গা পার হয়ে ঈশান কোণে গো-শকটে অথবা পদব্রজে ৪ (চার) মাইল গেলেই জুড়নপুর গ্রাম —গঙ্গাতীরে মহাশ্মশান। (গ্রামের) প্রান্তভাগেই মায়ের পীঠস্থানটি। আবার পলাশী দেবগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে প্রায় ১২ (বার) মাইল বাসে নকুড়ে কালীগঞ্জ। ওখান থেকে হাঁটা পথে দু'মাইল জুড়নপুর। স্থানটি নদীয়া জেলার মধ্যে হলেও ইহা নদীয়া মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যস্থলে অবস্থিত। নাটোরের রাজা শক্তিসাধক রাজর্ষি রামকৃষ্ণ এখানেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন বলে প্রসিদ্ধি। এখনও ভূগর্ভে তাঁর সাধন গৃহটি রয়েছে। বটবৃক্ষের মূলে মহামায়া মহাদেবীর প্রতীক-স্বরূপ সিঁদুর-মাখান একটি শিলাখণ্ড দেখতে পাওয়া যায় এবং বৃক্ষমূলে বসবার ও পূজা-সামগ্রী রাখবার বাঁধান বেদী আছে (প্রাণতোষিণীতন্ত্রধৃত প্রমাণানুসারে ১৩৪৯ সনের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় 'ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান' শিরোনামান্তর্গত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) সংখ্যক ক্রমিক সংখ্যার বর্ণনা দ্রষ্টব্য : পৃষ্ঠা ৯৯)।

ভাদ্র মাস, ভাগীরথী ভরপুর। সাধক ভাগীরথী তীরে সাটুই গ্রামে একদিন হাজির হলেন। স্থানটি মুর্শিদাবাদ জেলায়। এর অপর পারে কুমারপুর গ্রাম। ভাগীরথী তীরে নির্জ্জন স্থান বেছে নিয়ে বসে গেলেন ধ্যানে। ধ্যান গভীর হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ চোখ খুলে গেল। দেখলেন, একটি কুমারী মেয়ে পেতলের কলসী কাঁকে নিয়ে কুমারপুরের ঘাটে নামল। জলে নেবে কুমারী

দেখল ঘাটের সামনে জলের ওপর একটা শবদেহ ভাসছে। কুমারী কলসী দিয়ে জলে ঢেউ দিয়ে দিয়ে শবটি সরিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শব থেকে জ্যোতিঃ বেরুল। এই দেখেই সাধক তাড়াতাড়ি ভাগীরথীর বুকে নেমে হেঁটে পার হয়ে গেলেন। এদিকে সেই কুমারী মেয়েও জল নিয়ে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করল। সাধক কুমারীর পিছনে চললেন। যে বাড়ীতে সেই কুমারী মেয়েটি ঢুকল সাধকও সেই বাড়িতে ঢুকলেন। বাড়ীর লোকজন সাধকের তেজোদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় মুর্ত্তি এবং হাতে কুঠার দেখে মুগ্ধ। ভয়-ভক্তি মেশান কথায় তারা সাধককে বললেন, আপনি—? সাধক বললেন, এখনই যে মেয়েটি জল নিয়ে এ বাড়ীতে ঢুকল সে সামান্য মেয়ে নয়, দেবীর অংশে এর জন্ম। এর বিয়ে হবে হরিনাথপুরের এক রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে। একে কোনদিন কাহারও উচ্ছিষ্ট জিনিস খেতে দিও না। তারপর সাধক চলে গেলেন। কিছুকাল পরে সেই কুমারীর পিতা কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র সন্ধান করতে করতে হরিনাথপুরে সেই যুবকের খবর পেলেন। যুবকটি জুড়নপুর কালীঘাটের দেবী জয়দুর্গার ভক্ত। গৃহত্যাগ করে শ্মশানে সাধনা করছেন। শেষে এই যুবকের সঙ্গেই কন্যার বিয়ে দিলেন। যুবক বিয়ে করে নববধুকে হরিনাথপুরের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। বউভাতের দিন নবপরিণীতা বধূ দেশের সামাজিক রীতি অনুসারে নিমন্ত্রিত আত্মীয় ও সমাজের নিমন্ত্রিতদের অন্ন পরিবেশনের জন্য ভাতের থালা হাতে নিয়ে প্রত্যেকের পাতে ভাত পরিবেশন করে চলেছেন, এমন সময় হঠাৎ বধুটির পরিহিত বস্ত্র শিথিল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, অথচ দুই হাতই আটক! অবশেষে দেখা গেল নববধুও তাড়াতাড়ি আরও দুটি হাত বের করে শিথিল বস্ত্র সামলে নিলেন। সকলের সামনে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েই ভাতের থালা রেখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ইনিই জুড়নপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিছুকাল পরে এক মেছুনী জুড়নপুরের পীঠস্থানে উক্ত বধুটিকে দেখে

প্রচার করেন যে এই কন্যাকে সে হরিনাথপুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখেছে। ইনি আর কেউ নন, ইনিই সেই নবপরিণীতা বধূ। শক্তিপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীঅশ্বিনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহরমপুর গোরাবাজারে বাস করবার সময় স্বস্ত্রীক ক্ষেপাবাবা তারানাথের কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনি ক্ষেপাবাবার তিরোভাবের পর এক সভায় এই অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস, এই সাধক আর কেহ নহেন, তারানাথ স্বয়ং।

অপর একটি অলৌকিক ঘটনা জুড়নপুর নিবাসী ৺হরিপদ মৈত্র মহাশয়ের বিধবা স্ত্রীর নিকট আমরা শুনেছি। কেতো নামে একটি বারো বছরের ছেলেকে সাপে কামড়েছিলো। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠশালীর ঘাটে তার বাবা ধুবুলিয়া নিবাসী ৺হেমন্তকুমার মৌলিক কলাগাছের ভেলায় শুইয়ে সর্পদষ্ট পুত্রকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ৺হরিপদ মৈত্র মশায়ের বিধবা স্ত্রী বললেন, ছেলেটিকে রোজারাও বাঁচাতে পারেনি। তারানাথ তাকে জল থেকে তুলে এই নির্জ্জন পীঠে এনে বাঁচিয়ে নিজের নিকটেই রেখে দেন। আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের পরে জানতে পারি যে সেই পুত্র যৌবনপ্রাপ্ত হলে গুরুর আদেশে কিরীটিপীঠে যাবার পথে নিজ জন্মভূমিতে একদিন সন্ধ্যায় অতিথি হয়েছিলেন। এঁর পিতা অনেক অনুনয় বিনয় কান্নাকাটি করেও অতিথির প্রকৃত পরিচয় আদায় করতে পারেন নি। এ বিষয়ে পুত্রের পিতা তারানাথবাবার নিকট গেলে তিনি বল্লেন, জীবিতাবস্থায় ত আমাকে দাও নি, মরা ছেলে আমি নিয়ে থাকি ত থানা পুলিস আছে যাও।

পুনঃ আরেক বিধবার একমাত্র পুত্রকে শ্মশানে দাহ করতে আনা হলে শব-সাধনার সময় তারানাথ ঐ মৃত পুত্রকে জীবিত করে দেন। পুত্রের মাতা পূজার জন্য দুই বোতল উৎকৃষ্ট 'কারণ' তারানাথকে দেন। তারানাথ বাবা সেই বোতল দুটি তাঁর গুরু বামদেবকে দেন। বামদেব একটি বোতল নিয়ে ভর্ৎসনার ছলে শিষ্যকে

বললেন, দাদা! মদ্ বদ্, মড়ার গন্ধ কইচে, খায়েন না। সে দিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তারানাথ আর কখনও 'কারণ' পান কিম্বা স্পর্শও করেন নি। বীরাচার ত্যাগ করে এবার দিব্যাচারে প্রবেশ করলেন সাধক তারানাথ। এবার দিব্যমার্গে সাধকের রূপান্তর হয় পূর্ণ। সেখানে প্রবৃত্তির কোন জড়তা, রুক্ষতা বা বাধা থাকে না। এসময় সাধকের সবটাই দিব্যশক্তিতে বিভূষিত ও ভরপুর। সত্তার কোথাও এতটুকুও আবরণ থাকে না—তাঁর অন্তর দৈব শক্তিতে চালিত হয়। বুদ্ধিসত্তা শুদ্ধ হয়ে বিশ্ব-দর্পণের কাজ করে। উর্দ্ধলোক অধঃলোক প্রকাশিত হয়। প্রাণ হয় বিশ্বপ্রাণে আর বিজ্ঞান হয় বিশ্ব-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত। দিব্যমার্গে সিদ্ধসাধক ঈশ্বরবৎ বিচরণ করেন; বিশ্ব কেন্দ্রীভূত হয়, দিব্যজ্ঞান, দিব্যশক্তি, দিব্য সম্পদের অধিকারী হন সাধক এবং অধিকারী হয়ে আপন স্বরূপে স্থিত হন তিনি।

॥ সাত ॥

জুড়নপুর থেকে সাতক্রোশ দূরে মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর গ্রামের উত্তরপ্রান্তে এক পল্লী মধ্যে কপিলেশ্বর শিবতীর্থ[৮]।

প্রাচীন কপিলেশ্বর শিবতীর্থে তারানাথ

কথিত আছে, মহামুনি কপিলদেব এই শিবতীর্থে দেবাদিদেব অনাদিলিঙ্গ মহাদেবের আরাধনা করতেন। এই দেবাদিদেবের আর এক নাম কপিলেশ্বর। গুরু বামদেবের আদেশে সাধক তারানাথ জুড়নপুর থেকে কপিলেশ্বরে আসেন দেবাদিদেবের আরাধনায়।

নদীয়ার রাজা শিবচন্দ্রও এখানে আসতেন তপস্যার্থে। কপিলেশ্বরকে কিরীটেশ্বরীর ভৈরব বলা হয়। বাংলার স্বাধীন নৃপতিগণ সকলেই এই কিরীটেশ্বরীর[৯] পূজা করতেন। শূরবংশীয়

কিরীটপীঠে তারানাথ

রাজা আদিত্য শূরের এক ঘোষণা থেকে জানা যায় যে দেবাদিদেব কপিলেশ্বরের ভোগ ও পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি বহু সম্পত্তি দান করেছিলেন। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত আছে, '৩৯৩ অব্দে বাজার শক্তিপুর ডিহি গঙ্গার ধারে কপিলেশ্বর আছেন তথারে, তৎপর ডিহি কণ্টকনগর (কাটোয়া) ইতিমধ্যে দেবভূমির না লইবে কর'। হুলোপঞ্চানন কৃত কায়স্থ কারিকা গ্রন্থে এই ঘোষণাপত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

কথিত আছে, সুদূর অতীতে এই কপিলেশ্বরে মহামুনি কপিলদেব তপস্যা করতেন। এইখানেই (মতভেদে) সগর সন্তানগণ কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত হয়েছিল। তাঁদের উদ্ধারের জন্য ভগীরথ তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সগর রাজার বংশীয়গণের উদ্ধার ও মুক্তির উদ্দেশ্যে পতিতোদ্ধারিণী মহাদেবী গঙ্গা মর্ত্তে অবতরণ করেন। এই ভূমিতেই ইন্দ্র বৃত্তাসুর বধ করেন। এখানে বজ্র ফেলা হয়েছিল বলে বজ্রের স্থান অপভ্রংশে বাজার সন বা

বাজার সাহু গ্রাম আজও আছে। মহাশক্তির শক্তি প্রদর্শনের লীলাক্ষেত্র এই বঙ্গভূমি। কিরীটিপীঠ এই বঙ্গেরই অন্তর্গত। সতী দেবীর কিরীট (মুকুট) পড়েছিল এখানে। চণ্ডীতে দেখা যায়—

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্র নয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণ হরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥

এই গৌড়েই শক্তির খেলায় পালবংশ শূরবংশ সেনবংশ গঙ্গাগিরী বংশ, মুসলমান এবং ইংরেজও উঠেছিল—এদের সকলেরই একে একে হয়েছে অপসরণ।

সাধক তারানাথ বলতেন, বহরমপুর চুয়াপুর সিপাহী বিদ্রোহের একটি স্থান। এক সময় এটা একটা বিরাট শ্মশান-ভূমি ছিল, তাই সাধনভূমি বলে এস্থান বেছে নিয়েছি। ইংরাজশাসক এখানেই বর্ম্মার প্রিন্স্ থিবোকে স্বপরিবারে একটি বাড়ীতে চারিদিকে গড় নির্ম্মাণ করে বন্দী করে রেখেছিল। এখানেই প্রিন্স্ থিবোর সমাধি। এটাও কিরীটি পীঠের অন্তর্গত। প্রসঙ্গতঃ তিনি আরও বলতেন, বর্তমান মনুর ঊর্দ্ধতন উত্তম মনুর অধিকারকালের পূর্ব্বে সাগর হিমালয়ের পাদদেশে ছিল। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপেই ছিল। এই কিরীটিপীঠও সেই দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। এক এক মনুর অধিকার কাল তের হাজার বৎসর। প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিলদেব সাগরের দ্বীপেই ছিলেন। বহু সাধক এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কালক্রমে সাগরদ্বীপ এখন বঙ্গোপসাগরের মোহনায়। এক সময় সাধক তারানাথ এখানেও সাধনরত ছিলেন। তিনি এখানকার নানাশ্রেণীর পৈশাচিক ঘটনার বর্ণনা করতেন। একদিন জুড়নপুর থেকে কপিলেশ্বরে আসবার সময় মঙ্গলপাড়ার ঘাটে এসে তারানাথ দেখতে পান যে এক পিশাচ এক পা সোমপাড়ার একটি বটগাছে আর এক পা অপর পারের মঙ্গলপাড়ার আরেক বটবৃক্ষে দিয়ে দাঁড়িয়ে নানাপ্রকার বিভীষিকা

দেখাচ্ছিল। তারানাথও নিজের কুঠার তুলে দাঁড়িয়ে এক হুঙ্কার দিতেই পিশাচ পালিয়ে যায়। স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ বিবিধ প্রকারের আধি ভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ঘটনার বর্ণনা প্রদান করেছেন। জুড়নপুরে সাধনার সময় তারানাথ কখন কিরীটিপীঠ কখনও বা নবদ্বীপের পোড়ামা-তলায় এসে সাধনা করতেন। এ সময়ে তিনি প্রায়ই কৃষ্ণনগরে গোয়াড়ীতে আমাদের বাড়ীতে আসতেন।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, সাধনপথে তারানাথ এক মহামহিমময়ী তপস্বিনী মাতার সঙ্গলাভ করেন। তাঁর কাছে তিনি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা[১০] শিক্ষা করেন। এই মহাসাধিকা হলেন মাতাজী গঙ্গাবাঈ। তাঁর পরিচয় শিক্ষিত সমাজে সুপরিজ্ঞাত। প্রায় ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯০ হতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত কালকে ঐতিহাসিকগণ জাতীয়তাবাদের (militant nationalism) যুগ বলে অভিহিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বেদের কুথ্‌মী শাখার থিয়োসফিস্ট[১০ক] অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রবর্ত্তক ম্যাডাম ব্ল্যাভাটস্কি, কর্ণেল অল্‌কট্‌ ও অ্যানি বেসেণ্টের উদাত্ত অহ্বানে আসমুদ্র হিমাচল বিশেষ করে অখণ্ড বাংলাদেশ চাঞ্চল হয়ে উঠে! চঞ্চল্য জেগেছিল নারীসমাজের মধ্যেও। তারানাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রচলিত স্ত্রী শিক্ষার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। স্ত্রী-জাতি যাতে সুমাতা, সুকন্যা ও সুগৃহিনী হতে পারেন সে বিষয়ে দেশনায়কগণ নানাভাবে চিন্তা করছিলেন। জাতীর মেরুদণ্ড শক্ত ও মজবুত করতে হলে নারী সমাজকে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষিতা করে তুলতে হবে। এই জাতীয় বোধ হতেই মহাকালী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন উপরোক্ত স্বপ্নদ্রষ্ট্রী ঋষিতনয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনে নিয়োজয়িত ভবিষ্য ভারতের বীরাঙ্গনা স্বরাজনেত্রী ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিতা মহাতপস্বিনী মাতাজী গঙ্গাবাঈ।

মাতাজী গঙ্গাবাঈ এর সান্নিধ্যে তারানাথ সক্রিয় ভাবে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ

॥ আট ॥

যাঁহাদের নিঃস্বার্থ দেশসেবা ও কর্ম্মকীর্ত্তির মধ্য দিয়ে জাতি তার লুপ্ত গৌরবকে ফিরে পায় আমরা সহজেই তাঁদের ভুলে যাই। তপস্বিনী মাতাজীর জীবনব্যাপী সাধনা জাতিকে সে দিনের বিধর্ম্মীর বিজাতীয় ভাবপ্লাবনের যুগে ভারতমুখী করেছিল। দুঃখের বিষয়, মাতাজীর সুখপাঠ্য শিক্ষাপ্রদ জীবনকাহিনী জনমানস হতে অপসৃতপ্রায়।

১৮৩৫ সালে রায় বেল্‌হর দুর্গে মাতাজীর জন্ম হয়। দাক্ষিণাত্যের আর্কট প্রদেশে মহারাষ্ট্রের রাজবংশ রাজ যোগীরাজের বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজকন্যা হয়েও শিশুকাল থেকেই বিলাসব্যাসনে ও ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে দিন কাটান নি তিনি। কঠিন বন্ধনের মধ্যেও বিদ্যানুশীলন ও শরীর চর্চ্চায় নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ অসাধারণ। ক্ষ্যাপাজী তারানাথ বলতেন, মহাকালী পাঠশালায় মাতাজী রচিত অনেক প্রবন্ধাদি ছিল। মাতাজী তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদের যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়তে উপদেশ দিতেন, অশ্বচালনা এবং অস্ত্রচালনায়ও বিশেষ পটু ছিলেন।

দুর্গাধিপতির দুহিতা হয়েও একদিন গভীর রাতে প্রহরীদের ভুলিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে মুক্ত তরবারী হস্তে গৃহত্যাগ করেন। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মন সকল প্রকার সংসার-বন্ধনের উর্দ্ধে ছিল। সত্যের সন্ধানকেই জীবনের চরম ও পরম করে নিয়েছিলেন। অজানার আহ্বানে গৃহত্যাগ করে তাম্রবর্ণ তীরে বল্কল পরে, ফলমূল খেয়ে তপস্যা আরম্ভ করেন। পিতা বহু অনুসন্ধান করে কন্যা গঙ্গাবাঈকে বাড়ী নিয়ে আসেন। এসময়ে সকলেই তাঁকে দেবী-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতে থাকেন। মাতাজী রাজনীতি বিষয়ে ও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন, পিতৃবিয়োগের পর ছোট ভাইকে সংস্কৃত, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে জমিদারীর

কাজে সুশিক্ষিত করে তুললেন। পিতার মৃত্যুর পর মাতাজী গড়ের পুনরুদ্ধার, পুরাতন কামানগুলিকে পরিষ্কার করে গড়ের উপর বসিয়ে রাখলেন। এই সময় মাতাজী ইংরাজ শাসকদের কোপানলে পতিত হলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রাজকুমারী মাতাজীকে ত্রিশিরা পল্লীর পাহাড়ে বন্দী করে রাখে। সেখান থেকে মুক্তিলাভ করে মাতাজী পুনরায় তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত থেকে তিন ক্রোশ দূরে। এই পর্ব্বতমালার পাদদেশে 'কালিখো' মন্দির। চারিদিকে পর্ব্বতমালা ও অরণ্য। আশেপাশে লোকালয় নেই বললেও হয়। এক সময়ে এখানে নরবলি হত। অনেক তন্ত্রসাধক এখানে সাধনা করেছেন। মাতাজীর ও তারানাথের সাধন সময়ে অলৌকিক বিভূতি সিদ্ধি ক্ষমতা দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেগুলি সাধারণ্যে সকল সময় প্রকাশ অসমীচীন বলে এখানে সেসব অনুল্লেখ রহিল। এই মন্দিরে সাধনার সময় জন্মভূমির, পরাধীনতা মোচনে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। জীবের দুঃখদৈন্য দুর্দ্দশা কষ্ট দেখে বিচলিত হয়ে তিনি দেবী সমীপে সে সব অপনোদন ও খণ্ডনের জন্য সকরুণ প্রার্থনা করেন। জন্মভূমির পরাধীনতার বেদনায় যখন তাঁর প্রাণ আকুল, সে সময় গভর্ণমেণ্টেরও নজর পড়ে তাঁর ওপর। একদিন তিনি মন্দিরে তপস্যায় রত আছেন এমন সময় পুলিশ মন্দির পরিবেষ্টিন করে। মাতাজী বুঝতে পেরে প্রহরীদের সামনে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রহরীগণ মাথা নত করে চলে যায়। এই সময় মাতাজীর মাতৃষ্বসা ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর নজর পড়ল মাতাজীর ওপর। তিনি মাতাজীকে তাঁর সব কাজে উপদেষ্টা সহচরী ও দেহরক্ষীরূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে রাণীর বিশ্বস্ত আরেক দেহরক্ষী পার্শ্বচর ছিল। এর নাম ছিল বলবন্ত সিং। সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাণীসাহেবা যুদ্ধস্থলে আহত হলে এই দুই পার্শ্বচর অশ্বপৃষ্ঠে মুক্ত তরবারী হাতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাণী

লক্ষ্মীবাঈকে সরিয়ে আনেন। মৃত্যুর পর গোপনে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে এঁরা দুইজনে গোপনে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান।

বলবন্তসিং ছদ্মবেশে ভারতের নানা জনপদ বন উপবন ও পার্ব্বত্য অঞ্চল এবং তীর্থ পরিভ্রমণ করে অবশেষে জুড়নপুর শ্মশানে কালীমন্দিরে এসে আত্মগোপন করে রইলেন, আর মাতাজী নানাসাহেবের সঙ্গে ইংরাজের সতর্ক প্রহরীকে চোখে ধুলো দিয়ে পাড়ী দিলেন নেপালে ও ব্রহ্মদেশে। ইহার পর দীর্ঘদিন নেপালেই হল তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র। সেখানেও জাতীয়তার মন্ত্র প্রচারই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। নেপালে অবস্থানের পর পুনঃ ভারতে ফিরে নৈমিষারণ্যে কঠোর তপশ্চর্য্যায় মগ্ন হন। এখান থেকে নানাতীর্থ পরিদর্শনান্তে জুড়নপুরে বলবন্ত সিং-এর সঙ্গে মিলিত হন এবং তথায় কিছুকাল সাধনমগ্ন থাকেন। বেশীরভাগ সময় এঁরা থাকতেন ভূগর্ভ-গৃহে। গভীররাতে শ্মশানে এবং মায়ের বেদীতে দেখা যেত।

১৯০২ সালে কাশীধামে তারানাথের সঙ্গে মাতাজীর পরিচয় হয়। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। তারানাথের অগাধ পাণ্ডিত্য ও দেশাত্মবোধ এবং তাঁকে বামদেব ও বশিষ্ঠের সিদ্ধাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী জেনে প্রীত ও মুগ্ধ হন। ক্ষেপাজী তারানাথ বলতেন, সহায়তা অনেকেই করতে পারে। রাবণবধের জন্য গুহক চণ্ডাল রামের বন্ধুর কাজ করেছিল এবং বালী বধে সুগ্রীবও। মাতাজী তারানাথকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা দান করেন এবং জুড়নপুরে একত্রে সাধনাও করেছিলেন। বালেশ্বরের মহাবিদ্রোহে মাতাজী বাঘা যতীনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য তারানাথের মাধ্যমে উৎসাহিত অর্থ সাহায্য পাঠাতেন।

মাতাজীর সংস্পর্শে এসে তারানাথের সক্রিয় ভাবে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ

তারানাথ বলতেন, এমন সময় আসবে যখন সারা বিশ্ব ব্রহ্ম-ধর্মে দীক্ষিত হবে তন্ত্রাদির প্রাধান্যে। মুর্খের তন্ত্রতত্ত্বীয় মহান তত্ত্ব বুঝবার অধিকার কোথায়? হেঁয়ালী ভঙ্গীতে তিনি বলতেন,

তন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব কাশীতে মণিকর্নিকার ক্ষেত্রে[১১] আছে। এ তত্ত্ব জানতে পারলে তার চন্দ্রাতপ অনুভবের ইচ্ছা থাকবে না।

গোড়াতেই বলেছি, মহাতপস্বিনী মাতাজী গঙ্গাবাঈ তৎকালীন শিক্ষার কুফল লক্ষ্য করে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব থেকে মুক্ত করে আমাদের প্রাচীন হিন্দু-রীতিনীতির আদর্শে জাতিকে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষিত করে তোলার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় নরনারীর নিকট আবেদন করেন। এই কলিকাতায় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন ও আধুনিক ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য করে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন ১৩০০ বঙ্গাব্দে, ৭ই বৈশাখ (ইং ১৮৯৩ সালে ১৯শে এপ্রিল) শুভ অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে। বিদ্যালয়ের নামকরণ করেন কালীঘাটের কালীমাতার নামানুসারী মহাকালী পাঠশালা। মহারাণী স্বর্ণময়ীর অর্থানুকুল্যে আপার সারকুলার রোডে তাঁর বাড়ীতে স্কুল স্থাপিত হয়।

তারপর উহা ১৮৯৬ সালে স্কুল চোরবাগানে রাজেন মল্লিকের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়ে পুনঃ সেখান থেকে ১৮৯৭-৯৮ সালে সুকিয়া ষ্ট্রীটে একান্ন হাজার টাকা ব্যয়ে নিজ বাড়ীতে বিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। মাতাজী তাঁর সমস্ত অর্থ অলঙ্কারাদি পাঠশালাকে দান করেন। তা'ছাড়া বহু রাজা মহারাজ জমিদার সংবাদ পত্রের মালিক দেশনেতা এবং স্বামী বিবেকান্দ ও তারানাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির দানও নেহাৎ নগণ্য নয়। এখানে সংস্কৃত ও বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। এ ছাড়া রান্না পূজা ও নানাপ্রকার শিল্পের কাজও শেখান হত। মাতাজী এবং এই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় কলকাতার কালিঘাটের মহিমহালদার ষ্ট্রীট, বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা জেলা), বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ জেলা) শ্রীরামপুর বগুড়া বর্দ্ধমান বারাকপুর যশোহর ময়মনসিংহ মালদহ প্রভৃতি যায়গায় ইহার বহু শাখা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০৭ সালে ২০শে এপ্রিল তপস্বিনী মাতাজী গঙ্গাবাঈ ৺কাশী প্রাপ্ত হয়েন। আজও মহাকালী পাঠশালা তাঁর পুণ্যস্মৃতি বহন করে চলেছে।

॥ নয় ॥

বিগতযুগে বাংলাদেশে তারাক্ষেপা ছিলেন সাধককুলের অগ্রগণ্য। তন্ত্রতত্ত্বীয় সাধনায়[১২] সিদ্ধ ও আপ্তকাম তারানাথ অসংখ্য অধ্যাত্মপিপাসু নরনারীকে সঙ্গ দান করে তাঁদের কৃতকৃতার্থ করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে তারানাথ আধ্যাত্মমুক্তির সাধনার গণ্ডীর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না। ভারতবর্ষকে বিদেশী অধিকারীর পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের সংগ্রামে তাঁর অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী প্রয়াস স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়।

তন্ত্রসাধকগণ ধরিত্রী বা বসুন্ধরাকে আপন ইষ্ট মাতৃকাস্বরূপেই দেখে থাকেন। ক্ষেপাজী তারানাথ বলতেন, মাটি মা। এই মা তোমার আমার সকল জীবের পুষ্টি সাধন করেন আরও দেন আয়ু আরোগ্য কান্তি বল মেধা স্মৃতি। মাতৃরূপা ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কাছে ধ্যানের বিষয়। বিদেশী বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তারানাথ গুরু বামদেবের নির্দ্দেশ লাভ করেন। তাই সাধক তারাক্ষেপা স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য নায়করূপে দেখা দেন এবং একাধিকবার কারাবরণ করেন ও অন্তরীণ হন।

১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত তারাক্ষেপা বিপ্লবীদলের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে কাজ করেন এবং সন্ধ্যা ও যুগান্তর পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। বারীন ঘোষ কিরণ মুখোপাধ্যায়, বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস রচয়িতা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায় সারভ্যাণ্ট্‌ ও বন্দেমাতরম্‌' পত্রিকার সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বসুমতী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছাত্রবন্ধু লিয়াকত আলি, ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস প্রভৃতি মুক্তিব্রতী দেশকর্ম্মীগণের সকলেই স্বরাজ সাধনায় তারাক্ষেপার অবদানের প্রচেষ্টা ও গুণাবলীর সপ্রশংস মর্য্যাদাপূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তারাক্ষেপাও ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেন। বিপ্লবী বাংলার অদম্য কর্ম্মী প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপতি মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই তারানাথের বিপ্লব প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯০৭ সাল ও তার পরে ক্ষ্যাপাজীর জীবদ্দশায় প্রায়ই নির্য্যাতীত প্রখ্যাত দেশকর্ম্মী অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ মহাশয় প্রায়শঃই তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন। এঁদের কাছে শুনেছি এবং প্রায়শঃ নিজেও দেখেছি সাধক তারাক্ষ্যাপা তাঁর জীবনে অগণিত সাধক, বিপ্লবী রাজনীতিক কর্ম্মী রাজা মহারাজা শিক্ষাবিদ্ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রভৃতি বিচিত্র ধরণের মানুষের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনকে আধ্যাত্মিক এবং মানবধর্ম্মীয় মুক্তিমন্ত্রে প্রবুদ্ধ করেছেন।

ক্ষেপাজী তারানাথের দেশপ্রেম ইংরাজ গভর্ণমেন্টের চোখে একটা অপরাধ বলে গণ্য হল। এই সময় অর্থাৎ ১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত ক্ষ্যাপাজীর গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য আহম্মদ হোসেন নামে একজন পুলিশ অফিসার (যিনি পরে রাঁচীর ডি. এস. পি) ও কলিকাতা পুলিশ বিভাগের কর্ত্তা পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয়কে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণ লাহিড়ী মহাশয় আবার ক্ষ্যাপাজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। ক্ষ্যাপাজীর প্রচারের প্রধান লক্ষ্য ছিল যাতে দেশের ছেলে মেয়েদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্র গঠন হয়। এইসব যুবকদের মধ্যে থেকে বাছাই করে তিনি লোক সংগ্রহ করতেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় তারাক্ষ্যাপা সম্বন্ধে বলেন, ১৯০৩ সাল। তখন আমার বয়স মাত্র দশ বৎসর। সেই সময় আমি তারাক্ষেপা বাবার সান্নিধ্যে আসি। ক্ষেপাবাবা আমার মাতুল হুগলীর উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বৎসরে ২।৪ বার বা ততোধিক বারও আসতেন। এই সময় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীতে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক নিয়ে একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করবার চেষ্টা করছিলেন। এইসব যুবকদের সঙ্গে তারাক্ষেপাবাবা রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করতেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ইংরাজকে এদেশ থেকে তাড়ান সম্ভব নয়। আমার মত, ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে মানুষ কে, মানুষের জীবন কি, বাস্তবিক মানুষ অমর, রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প করতেন। প্রতি সন্ধ্যায় যুবকদের মুখে মুখে গীতার উপদেশ দিতেন। বিপ্লবীদলে যখন ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হল তখন তিনি খোলাখুলিভাবে বলতেন, আরও ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে হবে। এই সময় ক্ষেপাজী তারানাথের সঙ্গে ভবতারণ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি যুবকদের এবং আমার মত ছেলেদের সাংখ্যতত্ত্ব অতি সরলভাবে বোঝাতেন। এইসব যুবকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বড়াল। তিনি পরে আনন্দ আচার্য্য নামে নরওয়ের তুষারাবৃত পাহাড়ে গৌরীশঙ্কর মঠ স্থাপন করেন। তিনি সমুদয় ভারতীয় দর্শন ও মহানির্ব্বাণতন্ত্র নরওয়ের ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি তন্ত্রসাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে তারানাথের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং নূতন দিব্যজীবনের আলোক প্রাপ্ত হন। দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ নির্য্যাতীত দেশকর্ম্মী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়ও তারাক্ষেপার নিকট আসতেন। হুগলী কোর্টের যুবা উকীল হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতি রায়চৌধুরী, নির্মল মুখোপাধ্যায়

প্রভৃতি ক্ষেপাবাবার কাছে আসতেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই নরদেহে বর্ত্তমান। তারাক্ষেপা অত্যন্ত তেজস্বী, স্পষ্টবক্তা ও তীব্রভাষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরটি ছিল শিশুর মত কোমল ও সরল। তিনি গেরুয়াধারী অথচ বীর্যধারণে অক্ষম এরূপ সন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব বাবাজীদের পছন্দ করতেন না। ক্ষেপাজী তারানাথবাবা যখন তেজোদৃপ্তকণ্ঠে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতেন শ্রোতাগণ তখন মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর ভাষণ শুনতেন। যারা ক্ষেপাবাবার নিকট যাওয়া আসা করতেন, পুলিশ তাঁদের সংবাদ নিতো। বাল্যকালে তাঁর সঙ্গে যতটুকু মিশেছিলাম তাতে বুঝেছিলাম যে তিনি স্নেহময় নির্ভীক তেজস্বী ও সত্যাশ্রয়ী। সেইজন্য তাঁকে আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করতাম। আমি আজও এই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করে নিজেকে ধন্য মনে করি।

১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত শ্রীগুরু বামদেবের আদেশে ক্ষেপাজী তারানাথ বিপ্লবীদলে যোগদান করেন। বারীন ঘোষ, কিরণ মুখোপাধ্যায়, প্রবর্ত্তক সংঘের সংঘগুরু মতিলাল রায় প্রভৃতিকে বলতে শুনেছি, তারাদাদা আমাদের অন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন প্রচারক, আর এঁর সহকারী অন্তরঙ্গ ছিলেন তারানাথ। মাননীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী যখন ১নং হুজুরীমল লেনে সার্ভেণ্ট পত্রিকা প্রকাশ করতেন তখন তিনি প্রায়ই ক্ষেপাজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে আসতেন। ছাত্র আন্দোলনের নেতা লিয়াকাৎ আলি প্রায়ই আসতেন পরামর্শ করতে। ব্রহ্মদেশের ব্যারিষ্টার নন্দ ঘোষাল, মুন্সেফ্ অবিনাশ চক্রবর্ত্তী (ভারেঙ্গার) এবং বানোয়ারী লাল গোস্বামী (নবদ্বীপ) প্রভৃতিও এই বিপ্লবীদলে ছিলেন। এরা বোমার মামলায় ধরা পড়েন নি। ক্ষেপাজীও এই সময় ১৯০৭ চক্রধরপুর (সিংভূম) অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে চলে যান। তারপরই আলিপুর বোমার মামলা

আরম্ভ হয়। বিপ্লবী আন্দোলনের সময় সারা বাংলাদেশেই বিপ্লবীদলে যুবক সংগ্রহের কাজে ক্ষেপাবাবা লিপ্ত থাকেন।

বামদেবের জীবনীকার শ্রদ্ধেয় ৺হরিচরণ শাস্ত্রী (গঙ্গোপাধ্যায়) ইংরেজী ১৯০৬ সালে নৌকা করে চন্দননগর থেকে চুঁচুড়া যাচ্ছিলেন। নৌকায় বসে ভূপতি পাণ্ডা আর ফণিবাবু দু'জনের কথাবর্ত্তা হচ্ছিল—বামাক্ষেপা মহারাজের স্থলাভিষিক্ত কোন সংসার-বিরাগী শিষ্য আছে কিনা। ভূপতি পাণ্ডা বললেন, 'হ্যাঁ, চিরকুমার তারাক্ষেপা আছেন। তিনি এখন জুড়নপুরে। এই কথা শুনে শাস্ত্রী মশায়ের তারাক্ষেপাকে দেখার ইচ্ছা হয়। মনে মনে ভাবছিলেন, বামদেব তো কোন অনুষ্ঠান দিলেন না—গায়ত্রী ও তন্ত্রের অনুষ্ঠান[১৩] সম্বন্ধে এঁর কাছে জানতে হবে। ইনি কি তা দেবেন না ?"

চুঁচুড়ায় শাস্ত্রী মশায় কাছারীতে ওকালতি করতেন। ১৯০৬ সাল (বাং ১৩১৩ সন্), চৈত্র মাস। বিকালে উকিল শ্রীযুক্ত গিরিশ চট্টোপাধ্যায় মশায় বললেন, হরি, তোদের ক্ষেপা আমার বাসায় এসেছেন, তাঁকে দেখতে যাবি ? শাস্ত্রী মহাশয় তখনই তাঁর সঙ্গে চাটুজ্জ্যে মশাইর বাসায় গিয়ে তারাক্ষেপা বাবাকে দর্শন করে প্রণাম করলেন। প্রথম দর্শনেই প্রাণ বিনিময় হ'ল। ক্ষেপাজী তারানাথের সঙ্গে আর একজন ছিলেন গিরিশবাবুর গুরুভাই হরিপদ মৈত্র। শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তরের ইচ্ছা বুঝতে পেরে তারানাথ তাঁকে বললেন, আজ রাতে এখানে থাক। তিনি থেকে গেলেন। জলযোগের পর সকলে গঙ্গায় গেলেন। ফিরে এসে সকলে সন্ধ্যাবন্দনাদি করলেন। ক্ষেপাবাবা নিজ আসনে হরিণের ছালের উপর বসে রইলেন। এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় তার বামলীলা বইতে লিখেছেন, ক্ষেপাদাদাকে আমি কোন দিন নিদ্রা যেতে দেখি নি ; আমরা আহারাদি করে এলাম, ক্ষেপাদাদা নিজেই পৃথকভাবে একটু সুজি করে নিলেন। আহারাদির পর আমি ও ক্ষেপাদাদা বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে রইলাম ;

তিনি হরিণের ছালের উপর শুয়ে রইলেন। আমি মনে মনে চিন্তা করছি, বামদেব তো কোন অনুষ্ঠান দিলেন না, ইঁহার নিকট কি তা পাব না ; ইনি কি গুরুকৃত্য করবেন না? তন্দ্রাবস্থাতেই দাদা আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, কি রে একজনকে মাথা বেচে আবার অন্যজনকে তা বেচবার ইচ্ছা? আমি লজ্জায় মরে গেলাম। ক্ষেপাদাদা বললেন, 'তোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, তার চিহ্ন শ্রীগুরু ময়ূরভঞ্জ থেকে আসবার পথে দিয়েছিলেন। আমার ইচ্ছা হ'ল যে দাদা যেন পরদিন আমার কলিকাতার বাসায় পদধূলি দেন। ভাবলাম মুখে কিছু বলব না। ক্ষেপাদাদা কেমন অন্তর্যামী দেখি, আমার বাসনা পূর্ণ করেন কিনা। পরদিন বৈকালে উভয়ে কলিকাতায় যাত্রা করলাম। সন্ধ্যায় হাওড়ায় নেমে ক্ষেপাদাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় যাবেন, একটা গাড়ী ঠিক করে দিই? ক্ষেপাদাদা একটু হেঁসে উত্তর দিলেন, তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে তোর বাসায় যাই, তখন সেখানেই যাব। আনন্দে নিজ বাসায় তাকে নিয়ে গেলাম। বাসায় এসে বললেন, আজ রাত্রে আর একজন তোর অতিথি হবে। আশ্চর্য্য হলাম, সত্যই কিছুক্ষণ পরে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার বাসায় ক্ষ্যাপাজীর সংবাদ জানতে এলেন। ইনিও ক্ষ্যাপাদার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। প্রশান্ত মূর্ত্তি উন্নত সাধক। ক্ষেপাদাদা সত্যই অন্তর্যামী। উভয়েই আমার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলেন। আহারাদির পর বহুক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ ও সদালাপ হল। সকালে চলিয়া গেলেন। ক্ষেপাদাদা স্বপাক করিলেন, তেল ও লবণ তিনি ব্যবহার করতেন না। অপরাহ্নে বিদায় নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, তোর গতরাত্রে উৎমীলন হল।' দাদা আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন, মধ্যে মধ্যে আমার বাসায় পদধূলি দিয়ে আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করেছেন। তাঁর কৃপায় আমি বিশেষ উপকৃত। তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর নিকট আমি গায়ত্রী ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান[১৩]

পেয়েছি। তিনি আমায় দুর্লভ তারাবিদ্যার সন্ধান দিয়েছেন (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি রামের প্রতিনিধি ছিলেন।

আর একবার সন ১৩৪১ সালে বামাক্ষেপাবাবার জীবনী বামলীলা লেখবার সময় তারাদাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বুড়ো মহারাজের জন্মদিন, তিথি বা মাস সন্ ইত্যাদি কিছুই ঠিক জানতে পারছি না, আপনার কিছু জানা আছে কি? তারাদাকে জিজ্ঞাসা করার কারণ—ইনি আকুমার সন্ন্যাসী, যোগী মহাপুরুষ। ইহার দিব্যদৃষ্টি খুলেছে, এমন কি চর্ম্মচক্ষু দ্বারাও তিনি জগৎ দেখতে পান, কর্ণেও সূক্ষ্ম শব্দ ধরতে পারেন, পশুপক্ষীসহ সব প্রাণীর ভাষাও বুঝতে পারেন। উত্তর দিলেন, ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, তারাতিথি। তারাতিথি বুঝতে না পারায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন, তারাতিথি অর্থে রটন্তী চতুর্দ্দশী এবং শিব চতুর্দ্দশী বুঝায়। সন জিজ্ঞাসা করায় অন্য কথা তুললেন।

পরে পূজনীয় ৺হরিচরণ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করে জানতে পারেন, ১২৪৪ সালে ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শিবচতুর্দ্দশীর দিন বামদেবের জন্ম হয়।

॥ দশ ॥

১৯০৭-৮ সালে ক্ষ্যাপাবাবা সিংভূম জেলার পোড়াহাট রাজ্যে চক্রধরপুরের রাজা রাঠোর-রাজপুতবংশীয় অর্জ্জুন সিং-এর পুত্র কুমার নরপৎ সিং-এর[১৪] অতিথি হয়ে চক্রধরপুরের নিকট কেরা ষ্টেটের কালীবাড়ীতে কিছুদিন বাস করেন। এখানে লড়কা কোল বা যুদ্ধবাজ কোল, হোরাঁচী অঞ্চলের মুণ্ডাজাতির মধ্যে বিপ্লবী বীজ বপন ও বিপ্লবী মতবাদ প্রচার করেন। এখান হতে উত্তরে ছুটে যান নাগপুর, দক্ষিণে-পশ্চিম সীমান্তে দুর্গম ও ভয়ঙ্কর সারাণ্ডা—অরণ্যময় সাতশো পাহাড়ের দেশ, পূর্ব্বসীমায় ধলভূমরাজ্য, পূর্ব্ব-দক্ষিণে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। ময়ূরভঞ্জে হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ মৈত্র প্রমুখ বিশেষ ভক্তগণ থাকতেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজ ইহাঁকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। এই ময়ূরভঞ্জে কীচিংএশ্বরী মন্দির আছে। সেখানে কীচক বধ হয়েছিল, সেখানেও মধ্যে মধ্যে যেতেন। ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে বেড়াতেন এবং ১৯০৯ সালে রামপুরহাট নিবাসী বাগ্মী ও ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক পরলোকগত শ্রীজিতেন্দ্রেলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আদেশ করেন।

বস্তার ষ্টেটের মহারাজ শ্রীপ্রফুল্ল ভঞ্জ ক্ষ্যাপাবাবার বিশেষ অনুগত ভক্ত ছিলেন এবং খুব অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি কালীঘাট রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করে ক্ষ্যাপাবাবাকে কিছুদিন নিজ বাটীতে রাখেন এবং তাঁর নির্দ্দেশেই মহাসমরে যোগদান করেন। ১৯০৯ চক্রধরপুর (সিংভূম) থেকে বস্তার ষ্টেটের মহারাজা

প্রফুল্ল ভঞ্জের ষ্টেটের জেলা দায়রা জজ শ্রীমণিভূষণ ভাতুড়ী মহাশয়কে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তা থেকে প্রাসঙ্গিক সংশ্লিষ্ট অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। "...সোনার মানুষ আসিবে...তবে সোনার মানুষের সঙ্গে শক্তি এসেছে। খুব শীঘ্র উহা প্রকাশ পেতে পারে, তবে মনে রাখবে কল্যাই হবে না। সেই পরশুরাম। তাহার চাবি আমার কাছে...অনেক স্থান ডিঙ্গি মেরে একখানি ভরাসহ পরপারে উপস্থিত হবে...আমার শরীর খারাপ হবার কারণ জুড়নপুরের হারামজাদি চণ্ডালিনী......এ দেহের প্রতি যতদূর সম্ভব অত্যাচার এবং দণ্ড প্রয়োগ করেছিল—এ দেহের অনেক কাজ আজও বাকী আছে—তাই সকাল সকাল মহাকাল তথা হতে সরিয়ে নিয়েছেন। আশা করতে পারি, সুশক্তি উপাসনায় আবার গন্তব্যে উপনীত হব। অবশ্য কিছু না কিছু সময় পিছিয়ে পড়বে......।"

১৯১০ সালে তারানাথ তারাপীঠে পুনঃ ফিরে এলেন। রেলওয়ে স্টেশন থেকে নেমে রামপুরহাটে পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছানমাত্র, জিতেনবাবুর পিতামহী ক্ষেপাবাবাকে বল্লেন, তুই এই ধূমকেতু কোথা থেকে আন্‌লি? পশ্চিম আকাশে দেখলাম। এই ধূমকেতু বিশ্বে একটি শক্তিমান পুরুষ আনবে। উত্তরে ক্ষ্যাপাজী বল্লেন, হ্যাঁ, ইহা স্থির নিশ্চয়, ঈশান ইহার ক্ষেত্র। ...স্বয়ং মহাকালীই মহাকালের কাছে উপস্থিত—মাগী নেংটা বেশে শত্রুনাশে সর্ব্বদলের আধার পেয়ে মূলাধারে স্থিতি হ'লে পিরীতি।

এই সময় মণি ভাতুড়ী মহাশয়কে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে আরও লিখেছিলেন, সোনার মানুষ আসতে দেরী আছে, তবে শুদ্ধ সোনার বড়ই অভাব—ইংরাজ খাঁটি সোনা আদৌ রাখে নাই। অনেক পোড় না খেলে শুদ্ধ অসম্ভব। তবে কিছুটা কাজ হচ্ছে। ধর্ম্ম এক হাজারের মধ্যে একজন পায়, তাও লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করে স্থির হয়ে ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব হয়।

১৯১১ সালে তারানাথ বামদেবকে যে পত্র লিখেছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল (এই পত্রখানি নগেন পাণ্ডাকে লেখা হয়েছিল বামদেবের উদ্দেশ্যে তাঁকে শোনবার জন্য)। "শ্রীমান—, আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি। পরমদেব বুড়োজী মহারাজকে বলিও, আজিও আমার নবোদয়ের উদয়পুরে দ্বিমোহিনীতে স্নান হয় নাই। সাপে ছোবল দিয়ে বিষহীন অবস্থায় মুখ লুকাতে চায়। এখন বেদের নিরুপায়, দশনে অশনাঘাত দ্বারা তাড়াতাড়ি উত্তরমুখে ধাবিত হইল। তার পরে উদয়পুর ছাড়িয়া সপ্তঘড়িতে প্রবেশ করিব। মণ্ডলদের ঘরে প্রবেশ করে পরিণামে পশ্চাতে ফেলিয়া বিশাল মাঠ সম্মুখে উপস্থিত। এই ত রামপুর যাইবার পথ। পথের দক্ষিণ পাশে ডোবার ভেতর কত রক্ত-কুমুদ ফুটিয়া আছে। কেহ বা সদ্য, কেহ বা ফুটনোন্মুখ, কেহ বা ফুটে গেছে। ফোটাফুল পথ ভুলাইবার চেষ্টায় ছিল। ভাগ্যে ভবানী-মন্ত্র মনে পড়ায় সান ঘাটার আমবাগান অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ালাম। তখনও আমি বাগান পাই নাই। আবার দেখি, আশেপাশে ডোবার ভিতর শ্বেতফুল ফুটিয়া আছে। এইবার কুল বাঁচান হ'ল দায়। কিন্তু রাঢ়দেশে মুড়ির আধিক্য থাকায় রাস্তায় দেখিতে পাইলাম কেহ বা পাইট্যাক মুড়ি ঢেলে রেখে গেছে। হায় রে হায়—চিড়ে মুড়ির সংযোগ! তাই আবার ভাব পাইলাম, যথা ভাবের মানুষ ভাবে ফেরে। তখন হাঁপাতে হাঁপাতে আমবাগানে প্রবেশ করেছি। দেখিতে পাইলাম আশ্রয়দাতা দলের কালু সম্মুখে উপস্থিত। তিনি সোহাগ দিলেন, অভয় দিলেন! এইবার সানঘাটার পুল। এই পুলেই ত জাতফুল। এখন ভাবিতেছি কি করিব! কালুর আশ্রয়ে সাহস ছিল। তাই মিঞা নয়, ভাই মছলমান—হিন্দু নয় লো খৃষ্টান। নজর মে পয়ছান লেংগে। পহু আকবর হিন্দুস্থান। পুল পারের যোগাড়ে আছি। হাওড়া সাওড়া মুগলি হুগলি সাড়া মাড়া কাশী খাশী, অবশেষে প্রয়াগে প্রয়োগী হব। এই ত আজকার কথা। যখন

সানঘাটার মাঠে দিক ভুলে পড়েছিলাম, তখন উর্দ্ধমুখে বলেছিলাম —মাঠে পড়ে ডাকি তোরে কোথা লো ঐ কমলমণি। শ্বেত ফুলে ভুলাতে চায়, সরিয়ে দে লো পা তু'খানি। আঃ মরি মরি, ওলার সরবৎ আর কি! এইবার বুঝি বা সকালবেলার বাল্যভোগে চিড়েমুড়ি না গুড়মুড়ি না আদামুড়ি—কার সংযোগে হবে কেমনে বলিব। আগ্রার মুড়িতে গুড়ের সংযোগটাই সে দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সে দেশের গুড় তরল ও গন্ধভরা। এদেশের চিড়েমুড়ির সংযোগ মন্দ নয়। আমি লবণ বর্জ্জিত আদামুড়ির চেষ্টায় আছি। একটু ঝাল বটে, তা সাপুড়ের কাজ করিবে।

এর পরই তারানাথ তারাপীঠে যান এবং তথা হতে সংবাদ দেন, "২৬শে পৌষ, গতকল্য সোমবার সাড়ে আটটার সময় মহারাজ কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তহবিল খুলিয়া ভাণ্ডারের অধিকার দিয়াছেন। তাঁহার বাক্য Fade—উভয়ে Fade।" তারপর মহারাজ অন্যদিক অধিকার করিতে হুকুম দিলেন। ক্ষ্যাপাঠাকুরের হেঁয়ালিপূর্ণ পত্রে আভাষ পাওয়া যায় তিনি কি প্রকারে সমস্ত শক্তি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানর জন্য বামদেবের আদেশ প্রতিপালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

এই সময়কার তাঁর আর একখানি পত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হ'ল। "বর্ত্তমান সমাজ এবং কাল অবস্থায় ধর্ম্ম বাহির করা কতদূর কঠিন তাহা আলোচনা করিতেছি, কি পরিমাণ বল প্রয়োজন। গন্তব্যস্থানের খবর পাইয়াছি। অতঃপর দৈবী বল বা শক্তি আবশ্যক। ওরে, এবার ব্যাটারি-স্বরূপ শক্তি চাই, নতুবা কাজ হবে না। বর্ত্তমানে সেই শক্তিমতী যে জলের মধ্যে নাচ্ছে··· এইবার মহাবারিধি ভেদ করিয়া ঐ যে হাতীটা গলায় মালা পরাতে আসিবে। ওরে জবাফুল না হলে 'কেলে মাগীর' পূজা হয় না। এবার জবার চেষ্টা দেখ, পরে তুর্গাপূজার পদ্ম আবশ্যক করিবে। এই জবার উপর তোর ঠাকুর শূল হস্তে দাঁড়িয়ে সংহার চেষ্টায় আছে।

রুদ্রের শূল, ব্রহ্মার কমণ্ডলু, শক্তির অসি, বিষ্ণুর চক্র বরুণের পাশ যমের দণ্ড অবশেষে ইন্দ্রদেবের বজ্র উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে 'সুভদ্রা চাই', নতুবা শ্বেত অশ্বিনীর পথ অবরুদ্ধ। এ সুভদ্রা ঐ যে রে কালপুরুষের মাথায় বসে আছেন। এ তত্ত্ব পরে পাইবি। এটি গোপন। ...এই যে আয়োজন দেখিতেছ, ইহা সেই চণ্ডীর ৫ অঃ ৮০ শ্লোক হইতে ১২৯ তক—সেসব কথা তাই বলিয়া মনে হয়। কারণ 'ঈশান' ঐ দিক দিয়া আসিবেন। চণ্ডীর আগাগোড়া ঐ সমস্ত কথার অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবে......সমষ্টির ভিতর যখন দেবত্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে তখন ঐরূপই ইচ্ছা হয় । এই সমস্ত কথার ভাষা নাই, কি করিয়া ব্যক্ত করিব। মনে আছে ত ঐ দেশের সমীপ হইতেই কৃষ্ণ রুক্মিণী হরণ করিয়াছিলেন। ইচ্ছা হইলে কি হইবে ? আর চামাররূপী ভণ্ড ব্রাহ্মণকুলে শক্তিমতী নারী নাই বলিলেও ক্ষতি নাই—কাজেই ব্যাটারীর জন্য নীচে দেখিতে হইবে। যতগুলি আছে তারা প্রায়ই...... । আমাকে কি পথ অবলম্বন দ্বারায় কার্য্য শেষ করিতে হইবে তাহাই ভাল বুঝিতে পাচ্ছি না। মহাসমুদ্রে জবাফুল ফোটে, তাহাই সংগ্রহ করিতে হইবে—অবশ্য ঘোরনিশায় ! ঐ যে রে শ্বেত পেচক পাছে পাছে আছে—অশ্বিনী এখনও অনেক দূরে। সুভদ্রা যে-সে নন, ইনি কালগামিনী। ইচ্ছা থাক আর নাই থাক, কার্য্য করিতে হইবেই হইবে। বুড়োজী মহারাজের ইচ্ছা আমাকে শীঘ্রই স্থির আসনে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। পূজার সময় বহিয়া যাইতেছে—জাগাইতে আরম্ভ না করিলে চলিবে না...... । ৮ম বিদ্যা......ইন্দ্রের বজ্র বা হাতি চড়া কথাটা বড়ই গুরুতর। ইহার কাছে যেতে হলে বিশেষ তপস্যা এবং বহু-বহু জন্মের আরাধনায় হয়। এই বজ্রই রাজপথ, সুভদ্রা তাহার আশ্রয়দাতা, দেবতারা সকলেই ইহা তল্লাস করেন, তিনি তাহা দেন না। মহামিত্র বিশ্বামিত্র পারেন নাই, কেবলমাত্র মহাতাপস, আর ভাগিনেয় আদিরাম। ঐ ত ঐর সুপ্তা অহি রাজরূপা মোক্ষপদদায়িনী । ইতি—

এই ত সম্মুখে কত পাচ্ছি, কিছুই সেমত নয়। বরুণের ঘরে যে আগুন আছে তাহাই এখন উপাস্য। চণ্ডনাথের চম্পকারণ্য অতীব গোপন—ইহাই বাড়বানল বা সেই বরুণের অগ্নি……। বুড়োজী মহারাজ একদিন বলেছিলেন, জুড়নপুরের মা ইংরাজি পড়েন……সেকথা কখনও মিথ্যা হইবে না……সময়ে যাহার দ্বারা শান্তি মিলিবে সেটা ইংরাজী পড়াই হবে। একটু দূর বলে মনে হয়। শীঘ্রই তা ধরিতে আবশ্যক হবে, কারণ রুক্মিনীর বাবার দেশে পীত ধোঁয়াচ্ছে—একটু আভাষ পেয়েছি।……দেবত্ব প্রতিষ্ঠা না করিলে উপায় নাই। আজ পর্য্যন্ত সে কাজ নাস্তি। সব পীঠএ এপীঠ ওপীঠ করে দেখা গেল—দমবাজ শালারা এঁটো চাটিতে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

১৯১১ সালে ১৩ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত মণি ভাদুড়ী মহাশয়কে তারানাথ এক পত্রে লেখেন, সোনার মানুষ আসবে, এ কথাটি বুদ্ধাবতারের—তবে সোনার মানুষ আনয়ন করতে শক্তি এসেছে, খুব শীঘ্র উহা প্রকাশ পাইতে পারে, তবে মনে রাখিবে—বিলম্ব নাই। শুদ্ধ খাঁটি সোনার বড়ই অভাব। ইংরাজরা খাঁটি সোনা আদৌ রাখে নাই। অনেক পোড় না খেলে শুদ্ধ অসম্ভব। জনক এসেছেন। তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হতে অল্প দেরী আছে। ধর্ম্ম এক কোটির মধ্যে একজন পায়—তাও লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্র পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্থিরীকৃত হয়ে ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব হয়। শ্রীবিদ্যা দেশে আসিবেন, তবে অনেকগুলি প্রবাহ ঢালিয়া। এবার গঙ্গা শিবের শিরে না বসিয়া, স্বয়ং পুত্র ব্রহ্মপুত্র মোক্ষতীর্থ হবে। বুড়োজী মহারাজের আদেশ, বালেশ্বরে থাকিবে—ইহার কোনটি সত্য হইবে তাহা কে বলিবে? রন্ধনশালায় বিরাট গৃহে কীচক বধ ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পেরেছ? গত কয়েকদিন আদেশ পাচ্ছি রামেশ্বরে যাও, তথা রামদাদা আছেন। এ কথাটি যে কতটা মূল্যবান ও তাহার মূলে যে কত সত্য আছে তাহা ভাববার দরকার।”

সাধক শুধু আপনার মধ্যে শক্তি ধরেন না, তিনি হাজারো প্রাণে আগুন জ্বালাতে পারেন। এমন একজন এই সাধক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—বাঘা যতীন। একেই সাহায্য করার জন্য বুড়োজীর আদেশে, মাতাজী ও ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সহধর্ম্মিণীর সহযোগীতায় বালেশ্বরের গভীর অরণ্যে অর্থাদি দিয়ে এসেছিলেন। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১১ পর্য্যন্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যায় বিপ্লবী বীজ ছড়াইয়া বেড়ান সাধক তারানাথ। তারপর গুরুর আদেশে এবং পরপর তিনবার দৈববাণী শুনলেন, কামরূপ যাও। অবশেষে কামরূপ যাওয়াই স্থির করলেন ক্ষ্যাপাজী তারানাথ। ১৯১২ সালের প্রথমেই নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলেন, ভাগাড়ে আবার নতুন করে নামব কি? তবে আমি কিছুই চাই না—বুড়োজীর আদিষ্ট কাজ শেষ করতেই হবে—রাষ্ট্রই চাই, চাই-ই। বর্ষনাপ্রিয়ার দেশেই চিরন্তন সত্য ও শীল, তা'হলেই বশিষ্ঠের কামরূপ জয় হতে পারে। সাপ এখনও মরে নি সত্য, তবে সূচনা মাত্র। বুজরুকি একটা চাই, কিন্তু এ কাজের মধ্যেও একটা অন্তরায় আছে—বাজারের আবর্জ্জনাই সিদ্ধ হবার অন্তরায়। অনেক দেখে শুনে বিচার করে তবে ত আত্মীয়তা, নতুবা পরিণামে দুঃখ আছে। একটু সুখের কি শান্তির গন্ধ পাওয়া যাবে না।

অনুচর—সিদ্ধ হওয়ার দিকেও অন্তরায়······বীরভদ্রকে যে পাঠাবার জন্য প্রস্তুত হব তারও একটু অন্তরায়। এদেশ সেদেশ করে ঘুরে হায়রান, ভারসা পাচ্ছিনা, ভরসা ভবিষ্যতে রসরাজ আর জানকীর বেটা। এই কামরূপ যাবার পূর্ব্বাভাস।

কামরূপে সাধনার সময় একদা তারানাথ সহসা বুড়োজী মহারাজের দর্শন ও নির্দ্দেশ পান, যাও মাণ্ডুকোতে—ঘর বাঁধ। আমি উত্তরকুরুবর্ষে যাচ্ছি, প্রশান্ত মহাসাগর তোলপাড় করে উত্তর কুরুবর্ষ থেকে গঙ্গা আনতে—এই সগরবংশের উদ্ধার করতে।

এই সময় ২রা শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বামাক্ষেপা বাবার তিরোধান হয়। এর পর তারানাথবাবা যে পত্র দেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করলাম : হতবুদ্ধি হইও না। তাঁহার দেহ চলে গেছে কিন্তু তাঁর শক্তি ও প্রভাব আমাদের ভিতর দিয়ে কাজ করিবে। পরিবর্ত্তনের সময় নানা চিন্তাই মনে উপস্থিত হয় সত্য, একটু স্থির হইলে উহা সরিয়া যায়। তুমি জান আমাকে তিনি কি ভার চাপাইয়া গিয়াছেন। এই সময় পরীক্ষার কাল উপস্থিত। বুড়োজীর স্মৃতিমন্দির সেই তারাপুরে গড়ব কি অন্য কোথায় তাহারও একটা মহাসমস্যা সম্মুখে উপস্থিত। তুমি জান যে আমি শুষ্ক দেশ একটুও পছন্দ করি না। বৃহৎ নদী-খালহীন দেশ ধর্ম্মের সুগম নয়। চিরকাল বুড়োজী ত্যাগের ধর্ম দেখিয়ে গিয়েছেন, তথায় নাটোরের কৃতদাস সাজিতে আমার একটুও বাসনা নাই। সুবিধামত স্থানও তথায় নাই, তারপর আরও কত যে। বুড়োজীকে আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে (ইহা ইচ্ছাকৃত), কারণ তাঁর প্রয়াণকাল দক্ষিণায়ণে হয়েছে।

ওরে, পথ ভুলে বাঙ্গালায় পড়েছি—ডাকৃছি তায় পথ দেখায়ে—এবার কোন পথে যাব—শ্যামা পথ ধরায়ে। সকলি বুঝি, উপায় কি? নিবৃত্তির পথে কখন যাব।······শুদ্ধ মা এদিকেই নাই—তার আর কি করা যায়। তা যতদিন না হচ্ছে ততকাল আমাদের কিছুই হবে না। বড়ই শক্ত সমস্যায় পড়েছি। বুড়োজীর নির্দ্দেশ, 'মাঞ্চুকোতে ঘর বাঁধতে, প্রশান্ত মহাসাগর তোলপাড় করে তিনি উত্তরকুরুবর্ষ থেকে গঙ্গা নিয়ে এসে সগরবংশ উদ্ধার করবেন।

···মঠ স্থাপনা বিষয়ে শ্রীবুড়োজী মহারাজ বলিতেন, যার চতুরঙ্গ বল নাই, তার কুক্ষিগত হবে না। কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী আমার নিকট প্রস্তাব করেছিলেন, আশ্রম করে দিব। আমি হ্যাঁ বা না কিছুই বলি নাই, পরে সংবাদ পাঠিয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। সমৃদ্ধিশালিনী একজন জমিদার পত্নী আমাকে একটা মঠ করে দিতে চেয়েছিল সুবর্ণ বিহারের মাঠে; একটু

স্বীকৃতি দিলেই হত—কিন্তু উহা উপযুক্ত স্থান নয়। এই সুবর্ণ বিহার একহাজার বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ-বিহার ছিল। অনেক প্রস্তরাদি অনেকে লইয়া গিয়াছে। অনেক পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা। এখন উহা একটি বিস্তৃত মাঠ। বুড়ো মহারাজের নির্দ্দেশের অপেক্ষায় আছি।

১৯১৩ সালে তারানাথ প্রায় এক বৎসর তিব্বত চীন মাঞ্চুরিয়া উত্তরকুরুবর্ষ অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। ওখান থেকে ফিরে এসেই কাশীধামে লক্ষ্মীকুমার ধনকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ীতে অতিথি হন। এই ধনকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সংস্থাপক ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্স্কির প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি তারানাথবাবাকেও গুরুর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। এই ধনকৃষ্ণবাবুর বাড়ী থাকা কালে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই তারানাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বরদাবাবু বহুকাল ফরিদকোট (পাঞ্জাব) রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। এর কাজ ছিল পর্য্যায়ক্রমে এক একটি শিখ স্থলবাহিনী (battalion) গঠন করে যুদ্ধে পারদর্শী করার পর সেটিকে ভেঙ্গে দেওয়া (disband)। আবার আর একটি নতুন দল গঠন করা, পুনঃ উহা ভেঙ্গে এই রকমে কয়েক হাজার শিখকে যুদ্ধের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

শ্রীযুক্ত মণি ভাদুড়ী মহাশয় লিখেছেন, "......আমি এই সময় তারানাথ বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। একদিন বরদাবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন এবং আরও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল বসু, শ্রীযুক্ত ভগবানদাস কাশীর কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। এই উপেন্দ্র বাবু মিসেস্ এ্যানি ব্যাসাণ্টে্র ডান হাত ছিলেন বললেই হয়। ভগবানদাস মহাশয়ও একজন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর বিশেষ নেতা ও প্রচারক ছিলেন। ইনি বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর শ্রীপ্রকাশের পিতা। একদিন আমি অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখছি যে আমার সামনে একটি আকাশচুম্বী বিরাট

পরশুরাম মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পারবি ত? আমি বলেছিলাম, আপনার কৃপা ও অনুগ্রহ হলেই পারব। তখনই সেই মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্বপ্নের সার্থকতা ও সত্যতা সম্বন্ধে আমার কি মনে হয়। আমি তাঁকে বললাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, এর উত্তর তখন আপনি দেন নাই।......১৯২৪—২৫ সালে আমি আর অভয় ডাক্তার দু'জনে টাউনসেণ্ড্ রোডে তারানাথবাবার নির্দ্দেশে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, এর উত্তর তখন তিনি দিয়েছিলেন।

নবদ্বীপ ও মহেশগঞ্জ আশ্রমে অবস্থানকালে ক্ষ্যাপাজী তারানাথ।

কাবেটার সাধনার ক্ষ্যাপাজী তারানাথ

॥ এগার ॥

১৯১৪ সালে তারানাথ শ্রীগুরু বামদেবের অন্যান্য ভক্তদের বিশেষ করে হরিচরণ শাস্ত্রী মহাশয় যাকে বামদেব 'শিমূলতলার ভট্‌চার্জ্জি' বলেছিলেন, তার অনুরোধে তারাপীঠের আসন গ্রহণ করেন। এই শাস্ত্রী মহাশয়ও শ্রীনবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে 'বামামিশন' সংগঠন করে দামোদরের বন্যায় ও দুর্ভিক্ষে প্রায় একবৎসর দুর্গত এলাকায় তারানাথ ত্রাণ কার্য্য করেন। এজন্য ১৯২১ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী সেই সময়কার বাংলার গভর্ণরের নিকট হতে একটি প্রশংসা পত্র পান। তারানাথ তাঁর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত এই বামা মিশনের সভাপতি ছিলেন। ক্ষ্যাপাজী তারানাথ কয়েকজন বামদেবের ভক্ত ও নিজের কয়েক জন অনুচরকে নিয়ে বামদেবের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং নিত্যপূজার ও ভোগরাগের জন্য কিছু জমি বন্দোবস্ত করেন।

বামামিশন প্রতিষ্ঠা, বামদেবের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ ও ভোগরাগ এবং নিত্য-পূজার ব্যবস্থা

১৯১৪ সালে ১৪ই আগষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তারানাথ তারাপীঠে থেকে কলকাতায় আসেন। কখন কলকাতায় কখনও বা নবদ্বীপের অপর পারে মহেশগঞ্জে (কৃষ্ণনগর হতে ছয় মাইল) শ্রীপঞ্চানন রায়ের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে জলঙ্গী বা খোড়ে নদীর ধারে একটি আশ্রম করে পঞ্চমুণ্ডের আসন প্রভৃতি স্থাপন করেন। এখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে রাত্রিতে নবদ্বীপের শ্মশানে শবসাধনা করতে যেতেন। এর আগে যখন নবদ্বীপে পোড়ামাতলায় একটি ঘরে থাকতেন তখন সেখানে একটি বটগাছের কোটরে এক অতিবৃদ্ধা যোগিনীমাতাও থাকতেন। স্বরূপগঞ্জে থাকার সময় এই কোটরবাসিনী যোগিনীমাতার কাছে মণি মল্লিক নামে এক বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যুবক যাতায়াত করত। সে তারানাথবাবার

সাধন ভজনের শ্রীপাত্র ও বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি করে পালায় এবং পরে হাজারীবাগে ধরা পড়ে ও সাজা পায়। তবে তার কাছে থেকে অপহৃত দ্রব্যাদি কিছুই পুনরুদ্ধার করা যায় নাই। ধর্ম্মজগতে তার সব উদ্যোগ নষ্ট হয়ে গেল! পোড়ামা হলেন নীল সরস্বতী, জ্ঞান দায়িনী—তারা, দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা। তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ নায়িকার বিশেষণে বিদগ্ধা—সৌভাগ্যশালিনী। যাঁরা আত্মবিদগ্ধা হন তাঁরাই শ্রেষ্ঠা। সেই থেকে গভর্ণমেণ্ট ক্ষ্যাপাবাবার উপর কড়া নজর রাখে। যুদ্ধ তখন পুরাদমে চলছে। দেখা গেল, সহসা স্বরূপগঞ্জ আশ্রম হতে পুলিশ ক্ষ্যাপাবাবাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারেই ১৯১৬ সালে নোয়াখালি জেলার হাতীয়া দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখেন। এই অন্তরীণ থাকাকালীন সুন্দরবন গোসাবা ষ্টেটের চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীঅশ্বিনীলাল রায় (বর্ত্তমানে তিনি অশিতিপর বৃদ্ধ, দমদম মতিঝিলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন) তারানাথের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমাকে এক পত্রে লিখেছেন,......১৯১৬-১৭ সালে সন্দীপে আমি যখন নজরবন্দী থাকি তখন ক্ষেপাবাবাও নোয়াখালি জেলার হাতীয়া দ্বীপে নজরবন্দী থাকেন। কিছুদিন থাকার পর আমরা খবর পেলাম, দারোগা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে এক দাসী কাজ করত। এই দাসীর একমাত্র পুত্র কলেরা হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্র শোকাতুরা দাসী ছুটে এসে ক্ষেপাবাবার পা দুটি জড়িয়ে ধরে। তারানাথ তৎক্ষণাৎ মাথায় লাঠি মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দেন। ঐ দাসী সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। স্থানীয় ডাক্তারকে দিয়ে দারোগাবাবু প্রাথমিক চিকিৎসা করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নোয়াখালি সদর হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষেপাবাবার বিরুদ্ধে নালিশ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, হাঁসপাতালের ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ খুলে কোন আঘাতের চিহ্ন বা ক্ষত দেখতে পেলেন না! এ বিষয়ে তদন্ত করবার উদ্দেশ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সাচী আর পুলিশ সুপারিনূটেন্‌ডেনট্ মহম্মদ টুনি মির্জ্জা, আইঃ বি. ইনস্‌পেক্টর

শ্রীশরৎদাস ও সার্কেল ইনস্‌পেক্টর শ্রী সেনকে সঙ্গে নিয়ে হাতীয়াতে তদন্ত করতে আসেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্ষেপাবাবাকে কিছু রূঢ় ভাষায় কথা বলায় ক্ষেপাবাবা সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-নিনাদে গর্জ্জে উঠলে তাঁর মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে ওঠে, চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরুতে থাকে! সেই আগুনের হল্কায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কপালের চুল পুড়ে সমস্ত কপালে কালো কালো দাগ হয়ে যায়। এতে সকলেই স্তম্ভিত ও হতবাক! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নতজানু হয়ে, 'ও ক্রাইষ্ট্! ও ক্রাইষ্ট্!' শব্দে চীৎকার করে উঠলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিস্টার সাচী জাতিতে ছিলেন জার্মান। তিনি বলতে লাগলেন, আমি ছোটবেলায় ভারতীয় সাধুদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনেছি। কালচক্রে ভারতীয় অসামরিক চাকুরীতে (Indian Civil Service) যোগদান করে ভারতে আসি। ইচ্ছে ছিল, ভারতের সত্যিকার সাধুদর্শন করব। আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হল!

অন্তরীণ করার কারণ সম্বন্ধে ক্ষ্যাপাবাবা বলেছিলেন, বাঘা যতীনের বিপ্লবে সাহায্য করাই বোধ হয় ইংরেজরাজের এই ভীতির কারণ। এই সময় অনেককেই বন্দী করে রেখেছিল ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমাদের তারানাথও ১৯২০ সালে কৃষ্ণনগরের ছুতারপাড়ায় ডাঃ শচীন মিত্রের ভাড়া বাড়ীতে নজরবন্দী হয়ে থাকেন। এই সময় স্বাধীনভাবে তারানাথ প্রায় সর্ব্বত্র যাতায়াত করতেন; তবে তাঁর গতিবিধির সমস্ত খবরাখবর পুলিশ রাখত। কলিকাতা রাঁচী প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন করে থেকেও যেতেন এবং মাননীয় ডাঃ যদু গোপাল মুখার্জী প্রভৃতির সহিতও দেখা সাক্ষাৎ করতেন। এই সময় বহু বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট লোকও তারানাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। ১৯২১ সালে কৃষ্ণনগরে নজরবন্দী থাকাকালে বহরমপুরের ডাক্তার রামদাস সেনের গ্রন্থাগারে নীলতন্ত্র নামক তন্ত্রগ্রন্থখানা থাকার খবর পেয়ে উহার অনুসন্ধানে আসেন।

কৃষ্ণনগরের নজরবন্দী এবং বহরমপুর নীল-তন্ত্রের সন্ধান

কাশীতে থাকার সময় উকীল শ্রীগোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত তারানাথের পরিচয় হয়। ইহাঁর পুত্রগণ শ্রীরাধাকুমুদ, শ্রীরাধাবিনোদ ও শ্রীরাধাপদ মুখোপাধ্যায় বহরমপুরে থাকতেন। ক্ষ্যাপাবাবা এঁদের বহরমপুরের বাড়ীতে অতিথি হন। গোপালবাবুর জামাতা শ্রীচন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাধাপদবাবু তাঁহার অত্যন্ত অনুগত ভক্ত হয়ে পড়েন। চন্দ্রভূষণবাবু বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রাবাসের তত্ত্বাধ্বায়ক বা অধীক্ষক (Superintendent) ছিলেন। উক্ত চন্দ্রভূষণবাবুর পরিবারের সকলেই ক্ষ্যাপাবাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন এবং ক্ষ্যাপাবাবাও এদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এদের শ্রদ্ধা ভক্তির প্রবল আকর্ষণে তিনি মধ্যে-মধ্যে এঁদের বহরমপুরের বাড়ীতে অতিথি হতেন।

কৃষ্ণনগর নেদিয়ারপাড়া নিবাসী শ্রীনলিনী গঙ্গোপাধ্যায় বহরমপুরে পি. ডবলু. ডি.-র ঠিকাদার ছিলেন। তাঁহার বহরমপুরে কাদাইয়ের বাড়ীতেও মধ্যে-মধ্যে ক্ষ্যাপাবাবা এসে থাকতেন। ইহার একনিষ্ঠ সেবায় তৃপ্ত ক্ষ্যাপাজী তারানাথ তাঁহাকে খুবই ভালবাসতেন এবং আদর করে ডাকতেন, শ্রাবণী। ক্ষ্যাপাবাবা যতদিন বহরমপুরে ছিলেন এই নলিনীবাবুই তাঁর জন্য খালি পায়ে নিত্য গঙ্গাজল কাঁধে বহন করে নিয়ে আসতেন। রাধাপদবাবুর বিবাহ হলে এঁর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ক্ষ্যাপাবাবার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। চন্দ্রভূষণবাবুর কন্যা (বুলাদেবী নামে পরিচিতা) ভগবতী দেবীও (চট্টোপাধ্যায়) অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত ক্ষ্যাপাবাবার সেবা পরিচর্য্যাদি করতেন। ক্ষ্যাপাবাবার দেহত্যাগের পর আজও ইহাঁরা 'উমাবনম্ আশ্রমে' এসে ভক্তি-অর্ঘ্য নিয়মিত নিবেদন করে থাকেন। ক্ষ্যাপাবাবা কখনই বেশীদিন একস্থানে অবস্থান করতেন না। প্রায়ই কলকাতা চলে আসতেন। কখনও বাড়ী ভাড়া করে, কখনও বা ভক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও বা ব্রজহরি মিত্র মহাশয়ের বাড়ী থাকতেন। কখন কখন শ্যামাদাস কবিরাজ ও ডাক্তার

সুন্দরী মোহন দাসের বাড়ীতেও কয়েকদিন থেকে যেতেন। এই সময় বহু জ্ঞানীগুণী, রাজনৈতিক নেতা অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডলী ধর্ম্মযাজক ও ছাত্রনেতা প্রভৃতির সহিত নানাবিষয় আলোচনা করতেন। ১৯২৮ সালে ক্ষ্যাপাবাবা তাঁহার মনোনীত পাত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহ দেন এবং তাহার পর হইতে কলিকাতা এলে আমার কাছেই কৃপা করে অধিকাংশ সময় থাকতেন। প্রতিবৎসর অত্যন্ত গরম বর্ষা ও শীতের সময় বহরমপুর থেকে কোলকাতায় চলে আসতেন।

১৯৩৫ সালে চুয়াপুর গ্রামে, রেলওয়ে স্টেসনের খুব নিকটে বর্ত্তমান কলিকাতা শিলিগুড়ি জাতীয় সড়ক (National Highway) ও বহরমপুর রেলওয়ে ষ্টেশন-এ যাবার সংযোগস্থলে কিছু জমি ক্ষ্যাপাবাবার একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ও সেবক শ্রীব্রজহরি মিত্র মহাশয় নিজের নামে ও ক্ষ্যাপাবাবার নামে ক্রয় করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষ্যাপাবাবা উহার নামকরণ করেন উমাবনম্। মাত্র একখানি ছোট খড়ের ঘর, বেলগাছ তলায় কাঁচা ইটের দেওয়াল দিয়ে একটি ঘর এবং একটি ছেঁচা বেড়া খড়ের দো-চালা ঘর নলিনী গাঙ্গুলী মহাশয় তৈরী করিয়ে দেন। পরে সমস্ত উঁচুনীচু জমি মাটি-ভরাট করে ইটের গাঁথুনীর উপর তারের বেড়া দিয়ে কিছু জমি ঘিরে নেওয়া হয় ও দুইটি প্রবেশদ্বার করা হয়। দরজায় লেখা থাকত, বিনা অনুমতিতে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। বহরমপুরে থাকাকালীন তিনি নিঃসঙ্গই পছন্দ করতেন। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট স্থানীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি যাতায়াত করতেন। সঙ্গে দুইটি কুকুর ও একটি চাকর থাকত। আমরা কলকাতা থেকে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি—রন্ধনের জন্য কাঠ কয়লা সুজী মিছরী মধু ফলমূল ইত্যাদি নিয়ে যেতাম। কলকাতায় ক্ষ্যাপাবাবা চলে এলে অনেক সময় শ্রীব্রজহরি মিত্র মহাশয় উমাবনম্-এ গিয়ে থাকতেন। ক্ষ্যাপাজী তারানাথের অপর একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন

উমাবনম আশ্রম স্থাপন

বলরামপুরের জমিদার শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরী। তিনি তাঁর বলরামপুরের বাড়ী থেকে গোরাবাজারের বাড়ীতে যাতায়াতকালে প্রত্যহ ক্ষ্যাপাবাবাকে দেখাশুনা করতেন।

ক্ষ্যাপাবাবাকে আমি একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, বহুস্থান দেখাশুনা করার পর বহরমপুর বেছে নিলেন কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, এই ভূমির নাম ব্রহ্মপুরম্। এই ব্রহ্মপুরেই বাংলার শেষ শক্তির লীলা—পলাসীর মাঠ। এই চুয়াপুর একসময় শ্মশান ছিল। এখানে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়। নিকটে পঞ্চানন শিবের মন্দির ও বর্ম্মার রাজকুমার প্রিন্স্ থিবোর সমাধি। ইহা গৌড়ের এলাকা। গঙ্গার অপর পারে পাঁচ মাইল দূরে কিরীটি পীঠ—একান্ন পীঠের অন্যতম। এখানে দেবীর কিরীট (মুকুট) পড়েছিল। ইহাই ভারতের মুকুট—সেনবংশ শূরবংশ গঙ্গাগিরী বংশ পালবংশ মুসলমান ইংরাজ সবাই একে একে এই মুকুটের অধিকারী হয়েছিলেন, কিন্তু এদের পতনও হয়েছে। ইংরাজের পতন ঘটাবার জন্য গুরুর আদেশে আমার বাংলায় আসা। বাঙ্গালীজাতির আত্ম-বিস্মরণ ঘুচাবার জন্যই আমার সাধনা। বাঙ্গালীজাতির আচারহীনতা ধর্ম্মহীনতা উপলব্ধি করে এই মাটি স্পর্শ করে বলেছিলেন, আচারহীন পশুর দেশে এনেছ কুলকামিনী। এদেশের নাইকো আচার, জানে না সদাচার, শেষে কি আছাড় খেয়ে ভাঙ্গবো পা দু'খানি॥

যেখানে এখন কদম গাছটি বাঁধান আছে ঐখানে একটা উচু মাটীর ঢিপি ছিল। একদিন ঐখানে বসে থাকতে থাকতে বললেন, উমা মহেশ্বরের পূজার আয়োজন করতে হবে। পরক্ষণেই এই আশ্রমের নামকরণ করলেন উমাবনম্। এরপর এই জমিটা ভরাট করার জন্য পাশের শ্রীব্রজহরি মিত্র মহাশয়ের জমি থেকে প্রায় দুই হাজার টাকা খরচা করে মাটি নিয়ে সমতল করা হ'ল। বেলগাছ তলায় ফাঁক ফাঁক করে ইট বসিয়ে একটি দেওয়াল দেওয়া হ'ল। সামনেটায় একটু বারান্দা রাখা হ'ল। চাল খড় দিয়ে ছাইয়ে

মেঝেটা মাটিরই রাখা হ'ল। দূরে একটি কুয়া, সেটি এখনও আছে ; তার পাশে একটি ছেঁচা বেড়ার দোচালাঘর করা হল। একটি নলকূপ (Tube-well) বসান হল ঘরের সামনে, ঐ জমিতে আম কাঁঠাল বেল জাম ও মেহগনি গাছও ছিল। সমস্ত জমিটিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে বেড়ার ধারে ধারে ১২টি নারকেল গাছ বসান হ'ল। ক্ষ্যাপাবাবা নিজের হাতে একটি পেয়ারা গাছ একটি কদমফুল গাছ একটি মুচকন্দ ফুলের গাছ এবং আরও নানাজাতীয় ফুলের গাছ লাগান। চালাতে একটি গরু দুটি কুকুর ও একজন চাকর থাকত সর্ব্বদা। ক্ষ্যাপাবাবা প্রায় মৌনী থাকতেন। কাহাকেও তাঁর ঘরে বড় একটা ঢুকতে দিতেন না, নিঃসঙ্গতাই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। বিনা অনুমতিতে ঘরে কেহ ঢুকতে পেতনা। নলিনীবাবু ব্রজহরি মিত্র রামরঞ্জন চৌধুরী ও আমরা স্বস্ত্রীক ক্ষ্যাপাবাবার নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি নিয়ে যেতাম ও দেখাশুনা করতাম। দেহত্যাগের প্রায় ২০ (কুড়ি) বৎসর পূর্ব্ব থেকেই ক্ষ্যাপাবাবা কৌলাচারসম্মত আহার নিতেন, তবে বরাবরই দেখেছি লবণ ও তৈল বর্জ্জিত। লোহার চুল্লিতে (উনুন) কাঠকয়লা ব্যবহার করতেন। মুগডালের যূষ সুজি মধু ঘৃত খেতেন এবং কফিবীজ ভেজে গুঁড়িয়ে তৎসহ দুধ ও মিছরি মিশিয়ে চায়ের মত পান করতেন। দুধে সেঁকোবিষ ঘি জাফরান ও মৃগনাভী মিশিয়েও পান করতেন। ফলের মধ্যে পেয়ারা ছাড়া সব ফলই খেতেন। কেশুর ও আমলকী ফল তাঁর খুব প্রিয় ছিল। প্রত্যহ বিকাল বেলায় ডাব খেতেন। রাত্রে কফি পান করতেন। নিদ্রা যেতেন না, শুয়ে থাকলেও সর্ব্বদা জাগ্রত অবস্থায়ই থাকতেন এবং বলতেন আমি গুড়াকেশ (যে নিদ্রা জয় করে)। নিজ হাতেই খাদ্য দ্রব্যাদি তৈরী করতেন। বহরমপুরে কেউ গেলে তাকে স্বপাকে খেতে বলতেন। হোটেল বা কাহারও বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া পছন্দ করতেন না।

উমাবনম্ আশ্রমের বর্ণনা

বহরমপুর থাকাকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান উকিল জনাব আক্রামণ হক্ সাহেব ৺বিজয়া দশমীর পর ক্ষেপাবাবাকে সেলাম জানাতে আসতেন। কুমার কুমারীদের ও ভদ্রলোক যারা আশ্রমে আসতেন, ক্ষ্যাপাবাবা তাদের মিষ্টিমুখ করাতেন—রসগোল্লা এক হাঁড়ি আনাতেন, সকলকে দিতেন। তিনি বলতেন—আমি ব্রতশীল ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী নই। লোকালয়ে বাস করলে সামাজিকতা পালন করে চলতে হয়। কাউকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিতেন না। তিনি বলতেন, এই মাটিই হল মা। এই মাটি থেকেই তোমার আমার দেহ পুষ্ট হচ্ছে; সেই মাকে প্রণাম কর—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে। মধ্যে মধ্যে একআধ জন রাজনীতিবিদ এসে নির্জ্জনে আলাপ আলোচনা করে চলে যেতেন। যুবক কেহ তাঁর কাছে এলে, তাকে জিজ্ঞাসা করতেন পিতামাতা আছেন কিনা। থাকলে বলতেন, আমার কাছে এসেছ কেন? পিতার নিকট ফিরে চল—পিতামাতার সেবা কর, সব পাবে। ব্রাহ্মণসন্তান হলে, প্রত্যহ নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী ধ্যানজপ সহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করতে বলতেন।

পূর্ব্বেই বলেছি যে বহরমপুরে থাকাকালীন শ্রীচন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পরিবারবর্গ, রাধাপদবাবু ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী নলিনী গাঙ্গুলী, বলরামপুরের জমিদার শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীনলিনাক্ষ সান্ন্যাল, শ্রীশশাঙ্ক শেখর সান্ন্যাল মহোদয়গণের পরিবারবর্গ, শ্রীছত্রপতি রায়, শ্রীসুকুমার চট্টরাজ মহাশয়ের পিতা শ্রীচন্দ্রভূষণ চট্টরাজ প্রভৃতি এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে দেখা করতে আসতেন। তাও প্রাক্ অনুমতি ছাড়া দর্শন পেতেন না। ভৃত্য বলাই অথবা অন্য যে কেউ থাকতো তার দ্বারা সংবাদ নিয়ে তবে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিতেন। দেহত্যাগের কয়েকবৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার শ্রীপ্রথমনাথ চট্টোপাধ্যায়,

ডেপুটি শ্রীঅপূর্ব্বরঞ্জন বড়ুয়া প্রভৃতি কয়েকজন তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। ক্ষ্যাপাবাবার দেহত্যাগের পর এই অপূর্ব্ববাবুর প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে আমরা আশ্রমের মন্দির ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করতে সক্ষম হই। পরিণত বয়সে ইনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন।

কলিকাতা থাকাকালীন যেসব রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, দার্শনিক, তান্ত্রিক, চিকিৎসক, কবিরাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্ম্মযাজক সাধুসজ্জন দেখা করতে আসতেন, ক্ষ্যাপাবাবা তাঁদের বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তবে স্থান দিতেন। প্রথমে সেই সকল ব্যক্তির নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে দেখতেন। এসব পরীক্ষার পরও যারা শরণাগত হতেন তাদেরই তিনি স্থান দিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় শাস্ত্র আলোচনা, ডঃ শ্রীপ্রবোধ বাগচী মহাশয় তিব্বতী সাহিত্য, ডঃ শ্রীমহেন্দ্র সরকার ও অধ্যাপক শ্রীঅশোক শাস্ত্রী তন্ত্র, ডঃ মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞান, কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত বেদান্ত জ্যোতিষ ও পৌরাণিক মতে গ্রহনক্ষত্রের বংশাবলী এবং গঠন ও বিন্যাস প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তিনি নিজেও দুরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope) দিয়ে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে ছবি ও ছক এঁকে রাখতেন। দুঃখের বিষয়, দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি সেগুলি ও ষড়াননের জন্ম, বৃত্তাসুর বধ প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ ও নিজের ডায়েরীগুলির বহ্ন্যুৎসব করেন; অবশিষ্ট যাহা ছিল, ক্ষ্যাপাজীর দেহত্যাগের পর আশ্রমভৃত্যগণ সেগুলি আবর্জ্জনা মনে করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে নষ্ট করে দেয়। দু'চার খানি যা পেয়েছি তা থেকে কিছু কিছু উল্লেখ করেছি।

১৯৪৫ সালে দেহত্যাগের দুদিন পূর্ব্বে তারানাথ—প্রস্তুত থাক, যাইতেছি এই মর্ম্মে ৪ঠা ডিসেম্বর আমাকে একখানি টেলিগ্রাম করেন। তদনুসারে তাঁহার প্রয়োজনীয় কাঠকয়লা গঙ্গাজল ও

অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত রাখলাম, কিন্তু সেদিন তিনি এলেন না। পরদিন আমার সহধর্ম্মিণী অত্যন্ত চিন্তাকুলা হয়ে আমায় বহরমপুর যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এদিকে আমি ডাক্তার জে. এন. ঘোষ মহাশয়ের সহিত কঠিন রোগী নিয়ে বড়ই চিন্তিত ও বিব্রত। কাজেই যেতে পারলাম না, একখানি পত্র দিলাম।

৫ই ডিসেম্বর ক্ষেপাবাবা পুনরায় অপর একখানা টেলিগ্রাম-এ (ইণ্ডিয়ান্ পোস্ট্স্ এণ্ড টেলিগ্রাফস্ ডিপার্ট্মেণ্ট্, নং ০০৩৫৩৮, ৫ই '৪৫, ১৭-১৫ মিঃ) জানান—আমি গুরুতর অসুস্থ, শীঘ্র চলে এস। ঠিকানা ভুল হওয়ায় টেলিগ্রামখানি সময়মত আমার হস্তগত হয়নি, টেলিগ্রামটি বিলি হয় ৮ই ডিসেম্বর। এদিকে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৫ সাল বাং ১৩৫৬ সন্ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫।১৫ মিনিটের সময় গুরুমুদ্রা ধারণকরতঃ ক্ষ্যাপাবাবা মরদেহ ত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তাঁর ইচ্ছা ছিল, কলকাতার দশ মাইলের মধ্যে গঙ্গাতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য নিজে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন জায়গা জমিও দেখেছিলেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই তিনি গুরুধামে চলে গেলেন! আর আমরা চিরদিনের জন্য হারালাম একজন প্রকৃত আদর্শ গুরু! হৃদয়বিদারী এই দুঃসহ নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা তাঁরই শ্রীমুখ প্রোক্ত আশ্বাসিনী অভয়বাণী—যাহা তিনি সর্ব্বদাই বলতেন, আমি সপ্তভূমি গ্রীষ্মময় পুরী, বর্ষাময়পুরী, হিমালয় পুরী প্রভৃতি অতিক্রম করে বশিষ্ঠ ঋষির মত স্বদেহে পুনরায় ফিরে আসব।

গুরুমুদ্রা ধারণকরতঃ ক্ষ্যাপাবাবার দেহত্যাগ

তাঁর দেহরক্ষার সংবাদে সারাদেশে সাড়া পড়ে গেল! সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিশেষ তথ্যপূর্ণ কার্য্যকলাপ সম্বলিত জীবনী ও উপদেশাবলীর উপর তাৎপর্য্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ (ইং) সালের ১০ই জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় তারানাথ ব্রহ্মচারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রদান করবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হয়। সভার আহ্বায়কগণের মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস, শ্রীমৎ স্বামী অমৃতানন্দ (প্রবর্ত্তক সংঘ), শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধ বাগচী (শান্তিনিকেতন), অধ্যাপক ডঃ শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত (কনট্রোলার অব্ একজামিনেশন্স্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, দেশব্রতী প্রখ্যাত কর্ম্মী শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কবিরাজ শ্রীবিমালানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমাখনলাল সেন, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ; শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষুদিরাম বসু, শ্রীসারদাপ্রসাদ দত্ত, কবিরাজ শ্রীমনীন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, শ্রীকালীদাস তর্কতীর্থ, কবিরাজ শ্রীতারাচরণ ষড়দর্শনতীর্থ, রায়বাহাদুর শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী, ডাঃ গঙ্গাধর দীর্ঘাঙ্গী, ডাক্তার অজিতশঙ্কর দে, ডাক্তার জে. এন. ঘোষ এম. ডি., শ্রীসারদাচরণ শাস্ত্রী এবং বামা মিশনের আরও অনেক সভ্যবৃন্দ। তখন বামা মিশনের কার্য্যালয় ছিল ১।১।১এ, কলেজ স্কোয়ার ঃ কলিকাতা-১২। সম্পাদক শ্রীপশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ-সম্পাদক ডাক্তার শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায় সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। এই বিরাট সভায় প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় মাননীয় ডাঃ গঙ্গাধর দীর্ঘাঙ্গী মহাশয়কে সভাপতি এবং ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করে ৺ক্ষ্যাপাবাবার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এবং তাঁহার উপদেশাবলীর প্রকাশন ও সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠিত হয়।

তারানাথ ব্রহ্মচারীর তিরোভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলী

প্রথম কয়েক বৎসর নিয়মিত তারানাথের স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। ১৯৪৬ সালে ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতার স্টুডেন্ট্স্ হলে

মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে স্থির হয়, যদি মুর্শিদাবাদ পাকিস্থানের অংশে পড়ে, তবে ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি উঠিয়ে এনে কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগর কুঠীঘাটের নিকট গভর্ণমেণ্টের খাসমহল জমিতে পুনঃ সংস্থাপিত হবে। মুর্শিদাবাদ পরে পশ্চিমবাংলারই অংশ থেকে যাওয়ায় ক্ষ্যাপাবাবার সমাধি বহরমপুরেই রাখা হয়। তৃতীয় সভায় মন্দিরাদি নির্ম্মাণের প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত হয়। চতুর্থ সভা কলিকাতার মহাধর্ম্মাধিকরণের বর্ত্তমান মহামান্য মুখ্যন্যায়াধিপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষ্যাপাবাবা কলকাতায় অবস্থানকালে বাচনিক এবং পত্রাদি যোগে শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে যে সকল উপদেশাবলী দিয়েছেন তা থেকে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

অনেক ইউরোপীয় বা আমেরিকান এসে ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে নানা তত্ত্ব বিষয়ে প্রসঙ্গ আলোচনা করে যেতেন। প্রারম্ভে দোভাষীর মাধ্যমে বক্তব্য বলতে বলতে ক্ষ্যাপাবাবা শেষে তাদের ভাষায় নিজেই দোভাষী ছাড়াই প্রসঙ্গাদি কথাবার্ত্তা চালাতেন। অনেক রাজা মহারাজাও ইঁহার দর্শনপ্রার্থী হয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন। আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্তের বাড়ীতে থাকাই তিনি অধিক পছন্দ করতেন। কয়েকজন ধনী ও রাজা বাহাদুর বহু চেষ্টা করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অবশেষে বড়ই বিব্রত বোধ করেছেন। ফলে ইনিও চলে এসেছেন। কেহ চলে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিশেষ কিছু বলতেন না। যা বলতেন সবই হেঁয়ালীপূর্ণঃ যেমন, সাপের হাঁসি বেদে চেনে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন কেবল তারাই সেসব বুঝতেন। তিনি বলতেন, দারিদ্র্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা। অহঙ্কার সম্পূর্ণ বর্জ্জন না করলে কেহই তাঁর কৃপা লাভ করতে পারে না। তাঁকে কেহ সাধু

দর্শনে এসেছি বললে, তিনি অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে বলতেন; আমি স্নাতক—ব্রতশীল ব্রাহ্মণ, দেখছ না আমি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করি নি। সদ্‌গৃহস্থই সাধুপদবাচ্য। সাধ+উ+ষে, যে স্বস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করে। সন্ন্যাসী বললে তিনি বলতেন, আমি ত গেরুয়া পরি না, নির্য্যাতনের ভয়ে গৃহত্যাগও করিনি। আমি দেশের কাজে নেমেছি দৃঢ়চেতা মন নিয়ে, নির্য্যাতনেও বিচলিত হই নি—আদর্শচ্যুতও হই নি। তিনি সকলকেই কুলগুরু হতেই কৌলধর্ম্মানুযায়ী দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করে ধারা মেনে চলতে এবং সদ্‌গৃহস্থ হতে উপদেশ দিতেন। পিতামাতার সেবা, নিত্য নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করবার উপদেশ দিয়ে বলতেন—চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মানুষ হয়েছ, এ দেবতুর্লভ জন্মের সদ্ব্যবহার করতে ভুল না। স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের সন্ধিস্থলই পিতৃলোকের স্থান। পিতৃগণের পূজা না করে কোন দেবকার্য্য করা যায় না। পিতৃগণ প্রসন্ন না হলে কেহ দেবতার কাছে পৌঁছতে পারে না।

ঋষিভ্যঃ পিতরোজাতাঃ পিতৃভ্যো দেবদানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থাম্বনুপূর্ব্বশঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবের উপাখ্যান পড়লে ইহা বুঝা যায়। ধ্রুবের পিতার নাম উত্তানপাদ। সংসারে সম্পূর্ণ লিপ্ত হয়ে তুইপদ স্থাপন করলে চলবে না, অন্তর্মুখী হয়ে এক পা অন্ততঃ তুলে রাখাই হ'ল—উত্তানপাদ। ধ্রুব নক্ষত্রের ওপরে আকাশে এই উত্তানপাদ নক্ষত্র দেখা যায়। ধ্রুবের মায়ের নাম সুমতি—মতি স্থির অর্থাৎ ধ্রুব বিশ্বাস এবং সৎমায়ের নাম সুনীতি বা উত্তম নীতি। সেজন্য তাঁর ছেলের নাম উত্তম। রাজকার্য্য পরিচালনা করতে গেলে উত্তম নীতির প্রয়োজন। ধ্রুব সিংহাসনে পিতার ক্রোড়ে বসতে গেলে সৎমা ভৎর্সনা করে বলেন—তোমার ওস্থান নয়, ইহা আমার পুত্র উত্তমের স্থান। ধ্রুব কাঁদতে কাঁদতে নিজ মাতাকে সব বললে, মাতা

ধ্রুবকে সব কথা মধুসূদনদাদাকে জানাতে বললেন। ধ্রুবও সহজ সরল বিশ্বাসে বন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মধুসূদনদাদার সন্ধান করতে করতে পুলহ, পুলস্ত, নারদ প্রভৃতি সাত জন ঋষির সাক্ষাৎ পেলেন। ইঁহারাই পিতৃগণ। ইঁহারা ধ্রুবের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতে উপদেশ দেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে ধ্রুব নক্ষত্রের নিকটে সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রপুঞ্জ আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। ধ্রুব বিষ্ণুমন্ত্র জপ ধ্যান করে পরমপদ লাভ করেন।

তারানাথের উপদেশ হল—গৃহস্থমাত্রকেই পিতৃযান অর্থাৎ বংশের ধারা ধরে চলতে হবে। সুতরাং কুলগুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণীয়।

যে নাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গঃ তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে ॥

পিতৃপিতামহগণ যেপথ অবলম্বন করে গেছেন উঁহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। স্বর্গ-মর্ত্তের সন্ধিস্থলই পিতৃলোকের স্থান। পিতৃগণ প্রসন্ন না হলে কেহ দেবতার কাছে পৌঁছাতে পারে না।

কোন যুবক কিম্বা ছাত্র তাঁর কাছে আসলে, ক্ষ্যাপাবাবা তাকে লেখাপড়া ত্যাগ করে কখনও সাধনভজনের উপদেশ দিতেন না। তিনি বলতেন, নিরক্ষরতা অপেক্ষা বড় অভিশাপ নেই, অকৃতজ্ঞতার ন্যায় পাপও আর নেই। ক্ষ্যাপাবাবা বলতেন, 'মাটি-ই মা। যে মাটি হতে তোমার আমার সর্ব্বজীবের দেহপুষ্ট হয় সেই জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সীর বন্ধন ঘুচাবার লেখাপড়া শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া ধর্ম্মসাধনা চলতে পারে না। এজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে রাজাকে (শাস্ত্রার্থভাজা চলতোনুশাস্য বর্ণনা প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে)—শাস্ত্রশাসন হতে বিচলিত বর্ণসমূহকে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। ধৃ ধাতু থেকে ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি, আর ল্যাটিন রিলিজিয়ো—টু বাইণ্ড অর্থাৎ বন্ধন করা, একত্রীভূত করা। এক সমাজভুক্ত করাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্মসূত্রে এক হও। ধর্ম্মের তিনটি পথ—(১)জ্ঞান (২) কর্ম্ম ও (৩) উপাসনা। এই তিন নিয়েই ভারতের সাধনা। বেদের আশ্রয় নেওয়াই জ্ঞান, বেদকথিত কর্ম্মই কর্ম্ম। উপাসনা জড়ত্বের বাইরে সূক্ষ্মশক্তির আশ্রয়ে সূক্ষ্মতর হতে সূক্ষ্মতমে পৌঁছে দেয়। জড়শক্তির পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আশ্রয় স্বরূপ সূক্ষ্ম শক্তিসমূহকে অবধারণ করে ভারত পেয়েছে ভূমাকে। এই ভূমার তত্ত্ব মহেশ্বরের অষ্টমূর্ত্তির উপাসনার সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ তত্ত্বে নিহিত। ভারতকে যজমান মূর্ত্তিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। যজমান না হলে জ্ঞানে কর্ম্মে ও উপাসনায় শ্রী ঐশ্বর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা যায় না। ক্ষ্যাপাবাবা আরও বলতেন, সাধনমার্গ অত্যন্ত দুর্গম—

শুক্রেনারাধিতা বিদ্যা।
নায়মাত্মা বলহীনের লভ্য॥

ভূত প্রেত পিশাচ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর অধ্যুষিত প্রদেশ অতিক্রম করে তবে ত দেবদর্শন। ধর্ম্ম বহুদূর—মনোপূর্ব্বঙ্গমোধর্ম্ম। ভারত পরাধীন জাতি—দাসের জাতি! যাদের নিজস্ব রাষ্ট্র নেই, তাদের আবার ধর্ম্ম কি? যারা মনের সন্ধান রাখে না তারা ধর্ম্ম পাবে কোথায়?

রবে মধ্যে স্থিত সোম, সোম মধ্যে হুতাশন।
হুতাশনাৎ পরং সত্যং, সত্যাৎ ব্রহ্মাক্ষরাক্ষরা॥

এর কাছে কাছায় কে-রে। ভগবদংশ মানবকে তৎ সকাশে যিনি মিলিত করে দেন তারই নাম নাম ধর্ম্ম—যাকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে মানুষ বেঁচে থাকে। চরিত্রই মানুষের প্রকৃত বল, অর্থ ও দেহবল ত দু'দিনের। দারিদ্র্য অপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা আর নেই। তাই ঋষিকুল সকলেই দারিদ্র্যের মর্য্যাদা দিয়েছেন।

ইনিও দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে থাকা পছন্দ করতেন। ধর্ম্মকে রক্ষা করে চললে ধর্ম্মই রক্ষা করে। ধর্ম্মকর্ম্মের মূল আমাদের শাস্ত্রসমূহ—শাস্ত্র যোনিত্বাৎ।

শাস্ত্র ভগবানের আজ্ঞা, শাস্ত্র মত লঙ্ঘন করলে ভগবৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন-রূপ মহাপাতক হয়। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, এই বৈদিক উপাসনাই পরমকল্যাণের নিদান। শাস্ত্রের একাংশ লঙ্ঘন করে অপরাংশ পালন করতে গেলে পরিশেষে ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট হ'তে হয়। শাস্ত্রের শিক্ষায় ক্ষ্যাপাবাবার জীবন অনুপ্রাণিত ছিল বলেই তাঁর মুখ হ'তে শাস্ত্রসম্মত উপদেশ ভিন্ন কোন কথাই বলতে কখনও শোনা যায় নি। তবে উহা অত্যন্ত হেঁয়ালীপূর্ণ থাকত বলে অধিকারী ছাড়া অন্যের পক্ষে সহজে বোধগম্য হত না।

ত্রিকালদর্শী ঋষিরা বলেছেন, অপৌরুষেয় বেদ আমাদিগের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র—অধুনা বেদের প্রভাব নষ্ট হচ্ছে। লোক সকল ধর্ম্ম কর্ম্মে বিমুখ হ'য়ে অত্যন্ত অহংকারী ক্রূর লোভী নিষ্ঠুর কটুভাষী স্বল্পায়ু শিশ্নোদরপরায়ণ ও আত্মপ্রবঞ্চক হয়ে পড়ছে। তাই কলিকালে চাই সাধনানুকুল সু-তন্ত্র। তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল আশু ফলপ্রদ। বেদাদির সাধনতত্ত্ব মাত্র অবলম্বন করে প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় গার্হস্থ্য-প্রকৃতিতে থেকে ত্যাগ ও তেজ বজায় রেখে নির্ব্বাণ লাভ করাই কাম্য। বেদের সাধন অংশ নিয়ে শঙ্কর পঞ্চমমুখে পঞ্চম বেদ বা তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশ করেন। তাই শিবকে পঞ্চবক্ত্র বা পঞ্চানন বলে সকলে পূজা করে। এই উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রগুলি সাত্বিকতত্ত্ব। দু' তিন হাজার বৎসর হ'তে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ভান চলে আসছে, জাতীয়চরিত্রও তাই দিন দিন মলিন হতে মলিনতর হচ্ছে। অনেক মানুষ নাড়াচাড়া করলাম, এই বাংলাদেশে কোনটাই কাজের নয়।

ভগবানকে ভুলে থাকা মহাপাপ, সংসারে নানাকাজে সর্ব্বদাই যে তাঁকে ভুলে থাকি তজ্জন্য আমাদের সর্ব্বদাই অপরাধ ঘটে; কাজেই সর্ব্বদাই তার নাম স্মরণ মনন ও কীর্ত্তন একান্ত বিধেয়।

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥

যে সকল মানুষ এই পৃথিবীতে রামনাম জপ করেন তাঁদের কখনও মৃত্যুভয়াদি থাকে না। ইহা কেবল রাম উপাসকদের বলা হয়নি, রাম কৃষ্ণ শিব দুর্গা কালী প্রভৃতির যে নামে যে অভয় পায় তাদের পক্ষেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। এই জগতে মায়ার কার্য্য, মায়ার বাইরে যেতে হ'লে তাতে স্থিত হ'তে হয়। তার একমাত্র উপায় সর্ব্বদা নাম জপ। যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোঽস্মি—একমাত্র জপ অবলম্বন করলেই তা থেকে সব কাজ অতি সহজে সিদ্ধ হ'তে পারে। নাম ও নামী অভেদ, নামে স্থিতিলাভ করলেই নামীকে পাওয়া যায়। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জপ, অবিরত জপ—সর্ব্বদাই জপ তিনি স্বয়ং করতেন। বুড়োজী মহারাজও সর্ব্বদাই বলতেন, জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধি। জপিলে তিন লক্ষ হইবেন প্রত্যক্ষ, এই আজ্ঞা আছে তন্ত্রে। শিববাক্য রেখে গুরুপদে লক্ষ মন করে ঐক্য জপ, জপ বর্ণমালা।

ক্ষ্যাপাবাবা সকল সময়েই বলিতেন—

জপাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্ধ্যায়েৎ ধ্যানাচ্ছ্রান্তঃ পুনর্জপেৎ।
জপধ্যান পরিশ্রান্তঃ আত্মানঞ্চ বিচারয়েৎ॥

জপ করবে, জপ করতে করতে শ্রান্ত হও ত ধ্যান করবে, ধ্যান করতে করতে শ্রান্ত হ'লে তত্ত্ব চিন্তা করবে; পুনরায় জপ করবে, পরে আবার ধ্যান করবে, শেষে তত্ত্বচিন্তা করবে। আসল কথা, কাজ করা চাই। স্মরণ মনন প্রণাম প্রার্থনা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, নিত্য জপ ধ্যানধারণা রূপ উপাসনার সহিত স্তবাদি পাঠ স্বাধ্যায় অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। চণ্ডী গীতা রামায়ণ মহাভারত উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থের একটি নিত্য স্বাধ্যায় কর্ত্তব্য, পরিশ্রান্ত হলে অন্যান্য পুরাণাদিপাঠ করতে বলতেন।

ক্ষ্যাপাজী তারানাথের পত্র লেখার নমুনা দেওয়া হল।

ওঁ শিবা

উমাবনম্
বহরমপুর, বেঙ্গল
১২ই জানুয়ারী

ধনুরাত নোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বাউ ?

অভয় ডাক্তার !

তোমার পত্র পাওয়া গেল দেখ্‌তে থাক অবস্থা কি এসে গেছে। অভয়, দুষ্‌কর্ম্মের ফল ফলিবে। কাল একা একটা অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়। ঐ যে অষ্টভূজা মাতার চরণতলে একটু অন্ধকার; উহা অতীব ভীষণ এবং অগ্নিময় দৃশ্যমধ্যে দেবী অবস্থান করিতেছেন। তুমি যে সাদা প্রস্তরময় তারামূর্ত্তি দেখেছ তিনি সচল এবং বুদ্ধদেব।

ক্ষ্যাপাজী তারানাথ
শর্ম্মণ অমুসলমান

তারাপীঠের শ্মশানে যে একটি মস্ত বড় "ক্রব্যাদ" বাস করে তাহার খোঁজ কেহ রাখে না। ... ...

* * * *

(অপর একখানি পত্রের শিরোনামায়)

ওঁ শিবা

বহরমপুর
উমাবনম্
বুধবার

কিরীটিনী মহাবজ্রে সহস্র নয়নোজ্জলে—

অভয় !

হিন্দুর বিষম সমস্যা—নিশীথে প্রকাশ্য—পদ্ম কুমুদিনী দিনে উভয়ের বিপরীত উভয়ে না জানে। প্রকৃতি শুভমুহূর্ত্তে শুভকালে সত্যের আভাষ দেন। তাই রবির মধ্যে স্থিত সোম এসে গেছে রোধক কে ? পূর্ব্বে শুনেছ শুভদ্রা হরণ হয়ে গেছে। আজ শুনছ চক্রান্ত গতিতে চক্রী চক্রাচ্ছাদনে। আরে ভেড়ো ? শ্রীধরের ২টি চক্রের কথা কি মনে

ক্ষ্যাপাজী তরোনাথ
শর্ম্মণ অমুসলমান

নাই—তাই উপস্থিত হয়েছে ভাবতে থাকো দেখতে থাকো বৈরাগী পাণ্ডবের মধ্যে পূর্ব দক্ষিণ যো যতঃ।...

* * *

(অন্যান্য পত্র হইতে উদ্ধৃত—)

কর্মী পুরুষদের নিকট আত্মসমর্পণ দ্বারা দুষ্কৃতি ক্ষয়কারক শক্তি পাওয়া যায়। আগুন একবার যদি জ্বলে তা' হলে কখনও সম্পূর্ণ নিভিয়ে না দিলে নিভে যায় না, বাতাস পেলেই আবার জ্বলে উঠে। নিয়তি অখণ্ডনীয়। তবে দৈববল মহাবল। মহাপুরুষদের নিকট ভিন্ন এ বল পাওয়া যায় না।

সর্ব্বদা মন ও বুদ্ধির সহিত মারামারি কর, তবে ঘাত-প্রতিঘাতের মর্ম্ম বুঝতে পারবে। সময়ের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য।

অদীক্ষিতের সঙ্গে দেখাশুনাই তাহার মন্ত্র মুহূর্ত্ত তাহার অপেক্ষা করিতেছে। সেবা তার ঋষি, চুম্বন তার আলয়, দৃষ্টিই তার ইষ্ট দেবতা।

আশ্রয় ব্যতীত লতা উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। কতকগুলি কার্য্য যাহা ইচ্ছা ও সময়ের উপর নির্ভর করে—স্থির বিশ্বাস দ্বারা তাহা উপলব্ধিতে আসে, ব্রহ্মতত্ত্ব নিরাকরণার্থ কতকগুলি কার্য্যকারণ আবশ্যক করে—তাহাও স্থির বিশ্বাসের সহচর—যথা, ধর্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ, তুমি আমি আর সে। বিদ্যা যবছাতুতে পরিণত না হলে ধর্ম্ম অনুভব হয় না। বাহ্যিক দেবদেবী আদর্শ মাত্র।

পিপাসু অভিলষিত বস্তু লাভের জন্য তাহাদের পথ অনুসরণ করে—যথা আধুনিক জগতে বাম—নিত্যকামনার বশে ইন্দ্রিয় ও মন ক্রমে ক্রমে শিথিল পথে অগ্রসর হয়, তাহারই নাম মৃত্যু। নিঃসঙ্গের মৃত্যু নাই—তাই ধর্ম্ম সঙ্ঘ অবলম্বনে বুদ্ধত্বে উপনীত হইলে নিঃসঙ্গ হন। নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতা বিলক্ষণ থাকে—টাকাকড়ি স্ত্রী পুত্র এ ক্ষেত্রে শান্তি দিতে পারে না। আজকাল ভদ্রকালী-জিহ্বা পৃথ্বিময় ব্যাপক, তবেই বুঝিবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম

দিকে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—সকলি তাঁর ইচ্ছা—আপামর সাধারণ যন্ত্র মাত্র—স্থির নির্ভর হওয়া চাই। উপদেশ যতই মন্থন করিবে ততই নিত্য নূতন ভাব বা শক্তি পাবে। সহায়তা অনেকেই করিতে পারে—রাবণ বধের নিমিত্ত গুহক চণ্ডালও রামের বন্ধুকার্য্য করেছিল। ওরে! বাহ্য জগতেই জাতি নিয়ে মারামারি; নতুবা নিম্নজাতির ভিতরেও মহান তত্ত্ব থাকিতে পারে—একদিন এমন সময় উপস্থিত হবে এবং তন্দ্রাদীর প্রাধান্য জগৎ ঘোষণা করিবে। পশু ও মূর্খ তন্ত্রের মহান তত্ত্ব অবলম্বন করিবার কি অধিকার পায়? কাশিতে মণিকর্ণিকার ক্ষেত্র আছে—ইহার অর্থ জানিলে তখন আর চন্দ্রাতপ অনুভবের ইচ্ছা থাকবে না।

"ব্রহ্মা" "বিষ্ণু"ঃ "রুদ্র" ইত্যাদি মণিকর্ণিকায় স্নান করিবার জন্য নিত্য প্রয়াস পান। তাঁদের মধ্যে "রুদ্র" অনেকবারই ডুবলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহাদের ভাগ্যে আর ডুব দেওয়া হল না। তাহারা জল অনেকবার স্পর্শ করিলেন মাত্র। ধর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে কতকগুলি কার্য্যকারণ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। উদ্যোগ অবলম্বন করিলে উপকরণগুলি ছায়ার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। সময় হলে ক্ষেত্রোচিত উপকরণ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। ওরে! সৃষ্টিতে যদি বিরহ না থাকিত তবে মিলন সুখ অনুভব হতো না। অস্থির হবার দরকার নাই। গর্ভিণী নারীর মত যখন …হাঁইফাই করবি তখনই নিশ্চিন্ত। ধর্ম সংসার বিরোধী নহে, মাগী ছাড়িতে হয় না তবে সংযমী হ'তে হয়। কামনা বহ্নির সমতায় গভীর সত্তায় উর্দ্ধশক্তি ও ভক্তির উন্মেষ যা দেয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা, ভক্তির হৃদয়ে শুদ্ধি আনে। ভক্তির স্ফুরণে হৃদয়ে স্বচ্ছতা ও আনন্দ আর মহাশক্তির উন্মেষ—এই মহাশক্তি বদ্ধসৃষ্টি ছিন্ন করে জ্ঞানের উদার স্থিতি ও প্রশান্তিতে দেয় প্রতিষ্ঠা।

এইরূপ হেঁয়ালীতে উপদেশ দিতেন তারানাথ। তিনি সর্ব্বদা বলতেন, কর্ম্ম কর কর্ম্ম কর—কর্ম্মই হল জপমালা। কি কর্ম্ম

করব জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, অনলে অনিল ঢাল শান্ত ভব ঐ শীতল, প্রত্যুষে প্রভাস ভাসে দেবনদীতে দিয়ে সাড়া। আগুন জ্বালাও, আহুতি দাও। জিহ্বা ও লিঙ্গ সংযত রাখ, ব্যাভিচার করো না। রসনা ও উপস্থ এই দুইটিই জীবের ভীষণ ইন্দ্রিয়। জিহ্বা যেমন সর্ব্বরসের আস্বাদ সুখ ভোগ করে, তেমনি জিহ্বা বাক বা কথা বলার পক্ষে অপরিহার্য্য বস্তু। উপস্থও সেরূপ স্ত্রী-পুরুষের উভয়েরই সম্ভোগ ক্রিয়ার রস বা সুখভোগরূপ বিন্দু ত্যাগ ও বিন্দু গ্রহণাত্মক সৃষ্টি-যন্ত্র। এই দুইটি ইন্দ্রিয়ই জীবের কাম বা বাসনা অথবা ভোগলালসার যন্ত্র। ইহারই যম বা সংযম সর্ব্বাগ্রে করণীয়। অবশ্যই স্ত্রী সহবাসে আয়ু আরোগ্য কান্তি বল মেধা স্মৃতি বৃদ্ধি হয়—অতিরিক্ত হলেই উহারাই উহা হরণ করে। মা আমার রক্তবীজ বিনাশিনী—রক্ত+বীজ, রক্ত অর্থাৎ সৃষ্টাত্মক মাতৃরজঃ এবং বীজ অর্থে চৈতন্যময় বিন্দু পিতৃবীর্য্য, এই উভয়েরই মিলনে স্বভাবতঃ জীবের উৎপত্তি বা সৃষ্টি। "মা" এই সৃষ্টি বা পুনঃ পুনঃ জন্মের বিনাশিনী। তাঁর ধ্যান-উপাসনার ফলে জন্ম-মৃত্যু রহিত হয়। আসা সংসার ভোগের জন্য এবং যাওয়াই মৃত্যু। প্রারব্ধ ভোগান্তে নূতন কর্ম্মভোগের জন্য দেহধারণ। ইহাই রোধ করার নাম "জীবনমুক্তি"।

শব্দই ব্রহ্ম—মিথ্যা ভাষণে বা কোন ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তির সহিত কথপোকথন করেন সেই সময়ের মধ্যে কথা বলিলে ব্রহ্ম হত্যা করা হয়। তাই জিহ্বা সংযত রাখিয়া মৌনী অর্থাৎ মুনি হতে হয়। আর্য্য ঋষিরা ৫৬টা অক্ষরে 'মায়ের" রূপ দিতে পারিল না আর এই অনার্য্য বিজাতি তোদের ২৬টা অক্ষরে মায়ের রূপ দেবে! মা আমার বর্ণমালা, বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে।

এক সময়ে ক্ষ্যাপাবাবা কলিকাতায় স্বর্গীয় ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে এসে থাকতেন। সেই সময় ইহারই প্রেরণায় পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গুহামুখে, আহেরিয়া ও

প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে চণ্ডীবয়ের দ্বারা মায়ের সময়োচিত রূপ বর্ণনা করান।

ঋষিগণ সকল শাস্ত্রে স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন তাঁহাদের ব্রহ্ম প্রাপ্তির নির্দ্দেশ দিয়েছেন। একটি ভাবকে মুখ্য রেখে অন্য সকল ভাবেই তাঁকে পাওয়া যায়। সম্বন্ধ না করে সাধনা করতে গেলে রস আসে না। তাই সাধক গেয়েছেন—

কে তুমি কেমনে জানিব নির্গুণে
গুণহীন কভু সগুণ সাকারে।
তুমি বেদমাতা বিশ্ব বিনির্ম্মিতা
অ উ ম তুমি ব্যপ্ত চরাচরে॥
প্রভাতে কুমারী মধ্যাহ্নে যুবতী
সায়াহ্নে তুমি প্রবীণা মূরতি।
অনাদি অব্যয় অচিন্ত্য অক্ষয়
বটপত্রে ছিলে কারণ পাথারে।
পিতারূপে কর তুমি জনম প্রদাম
মাতারূপে তুমি পাল করি স্তন্যদান।
হইলে রমণী যৌবনের সঙ্গিনী—
সন্তানরূপে খেলা খেল এই সংসারে।
সত্ত্বগুণে তুমি রূপে চক্রপাণি
রজঃগুণে তোমায় বলে পদ্মযোনী
তমগুণে তুমি সাজ শূলপাণি
সৃষ্টি স্থিতি লয় ত্রিবিধ আকারে॥
ব্রহ্ম রূপে তুমি ভ্রম পদ্মনালে—
জীব রূপে তুমি আছ বাঁধা কর্ম্ম ডোরে
গুরুরূপে তুমি জ্ঞানাঞ্জন দানে
তোমায় আমায় কর অভেদ বিজ্ঞানে।
যেরূপে যে যেভাবে ভাবে তোমায়
সেই সেই রূপে দেখা দাও তাহারে॥ (স্বরচিত)

ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদসভায় বক্তৃতারত তারানাথ

তারানাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

...৩০শে নভেম্বর ১৯৩৯ তারিখে বেলডাঙ্গায় প্রাতে কর্ম্মী বৈঠক, সম্মেলন ইত্যাদি সেরে আমরা ১০॥-১১টাতে বহরমপুর এসেছি। আমাদের বাড়ীতে আমার বাবা মা ও পরিবারের অন্যান্য সকলের ও উপস্থিত বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের পর্ব্ব সেরে স্থানীয় কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রদের আয়োজন ও অনুষ্ঠান আসরে যাবেন, এমন সময় আমার প্রতিবেশী জনৈক ব্যবসায়ী শ্রীযোগেন্দ্রপদ ভট্টাচার্য্য একখানি গালা দিয়ে বন্ধ করা খামে চিঠি আমাকে হাতে দিয়ে বল্লেন "ক্ষ্যাপা বাবা দিয়েছেন।" আমি সুভাষের হাতে দিয়ে বল্লাম শ্রীমৎ তারাক্ষ্যাপা আপনাকে এই পত্র পাঠিয়েছেন। চিঠিখানা হাতে করে অন্ততঃ অর্দ্ধমিনিট তাঁর বিশেষ ভাবান্তর। চমকে বল্লেন, "তারা ক্ষ্যাপা বেঁচে আছেন, কোথায় থাকেন, আমি দেখা করব।" আমি বল্লাম, উনি সহরের প্রান্তরেই নিজ আশ্রমে থাকেন এবং বৈকালে লালবাগে যাওয়ার পূর্ব্বে যাতে দেখা হয় তার চেষ্টা করব। চিঠিটা খুলে লাল পেন্সিলের লেখা বিষয়বস্তুর উপর বার বার চোখ বুলিয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"দেখুন ত শশাঙ্কবাবু, এ সব বুঝেন, উদ্ধার করতে পারেন?" ছক্ বক্ কাটা সংস্কৃত ধ্বনি শব্দ সম্বলিত ভাষণ দুই পাতাতে লেখা (৪ পৃষ্ঠা)।

প্রথম পাতা (২ পৃষ্ঠায়):—

ওঁ

উমাবনম্

বহরমপুর, (বেঙ্গল)

১৪ই মার্চ্চ

সুভাষ বসু।

৫। ৬ বৎসর পূর্ব্বে একদিন ভিয়েনার কথা মনে কর। পদ চুম্বন ধর্ম্ম নয়। ইন্দ্রকে "গোত্রভিৎ বলে." আর বলদেবকে যমুনাভিৎ বলে। তুমি কিছু ভেদ করেছ? অষ্টবজ্র মিলন কাল এসে গেছে। কোথায় কার উদ্দেশ্যে যাইতেছ?

তোমাদের ×

পত্রে লিখিত উমাবনম্—বহরমপুর কোর্ট ষ্টেশনের পূর্ব্বে অনতিদূরে ক্ষ্যাপাবাবার স্বয়ং স্থাপিত আশ্রম। সেখানেই তাঁর দেহ রক্ষা হয়। এবং এখনও দৈনিক পূজাদির ব্যবস্থা আছে।

তারিখ স্থলে মার্গ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ।

সুভাষ কিছু চঞ্চলভাবেই পুনঃ পুনঃ সেইদিনই তাঁর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন।

কলেজের অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে আমি উমাবনম্ থেকে ঘুরে আসি এবং আমাদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় তাঁকে জানাই যে ক্ষ্যাপা বাবা কলিকাতাতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করবেন। আমরা পরোক্ষ জানতাম ক্ষ্যাপাবাবা কৈশোর যৌবনে বৃটিশের রেজেষ্টারীতে সন্ত্রাসবাদী ছিলেন এবং সন্দ্বীপে অন্তরীণে ছিলেন এবং আরো বেশী জানতাম যে তিনি ৺তারাপীঠের সিদ্ধযোগী বামাক্ষ্যাপার একমাত্র মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কিন্তু সেইদিন প্রথম বুঝলাম যে সুভাষ ও ক্ষ্যাপা একই পথের পথিক।······

কিন্তু সুভাষের নির্দ্দেশ অনুসারে এই পত্র শ্রীমৎ ক্ষ্যাপার কাছে উপস্থিত করে অষ্টবজ্র সম্মেলনের সরল ব্যাখ্যা চাইলে পত্রের প্রান্তভাগে যে অংশ সাদা ছিল তাতে পুনরায় স্বহস্তে লিখে দেন, "তোমার কর্ম্মক্ষেত্র ইউরোপের রণাঙ্গনে, সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।" সুভাষ দেখেছিলেন এবং গোটা লেখাটাই আমার কাছে দিয়েছিলেন। পত্র ও প্রান্তলিপি দুইই পরে সুভাষের অজ্ঞাতবাসের সময় শ্রদ্ধেয় শরৎ বসুকে দেখিয়েছিলাম। প্রান্ত অংশ কখন কিভাবে পত্রচ্যুত হ'ল, শরৎ বসু ও আমি উভয়ের কোন্ প্রান্তে আত্মগোপন করল তার হদিস পাইনি। শুধু আজও ভাবি—ভেবে কোন কিনারা পাই না। বন্ধু-বান্ধব সুধীজনকে জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাই না—শ্রীমৎ ক্ষ্যাপার এই বাণী জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণী, না পথপ্রদর্শকের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ।

পত্রের দ্বিতীয় পাতার অধিকাংশই সাধারণের কাছে হেঁয়ালি—তাই সেদিকের ফটোচিত্র আপাততঃ প্রকাশ করলাম না।

ভিয়েনা প্রসঙ্গে ক্ষ্যাপাবাবাকে প্রশ্ন করলে ইসরায় তিনি যা ব্যক্ত করেন তাতে মনে হয় যখন স্বর্গীয় ভিঠলভাই প্যাটেলের রোগশয্যার পাশে শুশ্রূষারত সুভাষ উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন বোধ করছিলেন সেই সময় শ্রীমৎ ক্ষ্যাপা সুভাষের অতি সন্নিকটে ছিলেন (এই উপস্থিতি কায়িক নয়)। সুভাষের কাছে এই ইসারা উপস্থিত করে কোন প্রতিবাদ পাইনি এবং আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি তবে যা পেয়েছি সেটা সমর্থনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।[১]

পাদটীকা

১। গাড়োয়ালের পূণ্যক্ষেত্রে ভবানীপতি কিরাতরূপে বনবাসী অর্জ্জুনের বীর্য্যবত্তা পরীক্ষা করে প্রীত হয়ে যুগান্তকারী নিজশূল পাশুপত অস্ত্র অর্জ্জুনকে দান করেছিলেন। এই পূণ্যক্ষেত্রেই প্রমথেশের জন্ম হয়। পুরাকালে হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে খাসিয়া জাতির বাস ছিল। এরা এখানে এসে বাহান্নটি গড় স্থাপন করে। খাসিয়ারা ভূত প্রেতের পূজারী ছিল, পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। শঙ্করাচার্য্য এসে এদের বৈদিকমতে দীক্ষিত করেন। এই স্থানের নামকরণ করেন কেদারখণ্ড। তিনি কেদারনাথ ও বদ্রীনাথের মন্দির নির্ম্মাণ ও যোশীমঠ স্থাপন করেন। এই সময়ে সমতল থেকে দলে দলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতিয়েরা এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। খাসিয়াদের অধীনতা স্বীকার না করে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করতে শুরু করে এবং চাঁদপুর গড় দখল করে। এদের (খাসিয়াদের) রাজা সোমপাল যুদ্ধে হেরে যায়। ৬৮৮ খৃষ্টাব্দের কথা। বঙ্গসন্তান রাজা কনকপালের সঙ্গে রাজা সোমপাল নিজ কন্যার বিবাহ দেন এবং যৌতুক দেন পনেরটি গ্রাম। এই রাজা কনকপালই টিহরী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী স্থাপন করেন শ্রীনগরে। কনকপালের সময় বহু বঙ্গসন্তান রাজদরবারে চাকরী করতেন। আমাদের তারানাথ বাবা বলতেন—প্রায় বারশো বছর বাংলার সঙ্গে গাড়োয়ালের সম্পর্ক। এখানে ব্রাহ্মণদের তেরটি শাখা ছিল। তারানাথের পূর্ব্বপুরুষ এদেরই একজন মূলপুরুষ কনক-পালের সঙ্গে গৌড় থেকে ওখানে যান এবং বংশপরম্পরায় রাজদরবারে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকেন। তাঁরা বাংলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করতেন, বাংলার প্রাচীন কীর্ত্তি ও কৃতিত্বের গুণগান করতেন। উত্তর প্রদেশে জন্ম হলেও গুরুস্থান বাংলায় বলে তারানাথ সর্ব্বদা বলতেন—আমি মনেপ্রাণে বাঙ্গালী।

২। হঠযোগ—হঠযোগ সম্বন্ধে কিছু জানতে হ'লে, যোগ কাকে বলে এবং যোগ কয় প্রকার ও কি কি সে সম্বন্ধে জানা দরকার। যোগ—কার সঙ্গে যোগ? পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সংযোগ ও মিলনের নাম যোগ। যোগ সাধনার দ্বারা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করতে

পারলেই অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। অষ্টসিদ্ধি লাভ হলে ত্রিলোক ভ্রমণ সম্ভব হতে পারে। ভগবান পতঞ্জলি বলেছেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। মনের দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তিসমূহ জয়ই আমাদের সাধনা। শীত-তাপে অবিচলিত হয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয় করে কঠোর সাধনা বরং সহজসাধ্য, কিন্তু মনে যে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দিবারাত্র বিরামহীন সংগ্রাম চলেছে তাকে নিরোধ করা, জয় করা খুবই কঠিন। কাম দমিত হল ত ক্রোধের উদ্রেক হ'ল, ক্রোধকে শান্ত করতে না করতে লোভ এসে দেখা দিল, লোভকে সংযত করলে আবার অহঙ্কার এসে অধিকার বিস্তার করল, অহঙ্কারকে কোনরূপে নিবৃত্ত করতে না করতেই মোহের উদ্রেক হ'ল, মোহের পর মাৎসর্য্য প্রবল হল—এইভাবে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির সংগ্রামে বিজয়লাভই প্রকৃষ্ট সাধন—ইহাই যোগ। ইহাই চিত্তবৃত্তি নিরোধ। যোগের চার প্রকার পথ বা মার্গ ঃ যথা—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠযোগ।

মন্ত্রযোগ—সাধনভজন, প্রণব বা ইষ্টমন্ত্র জপ ধ্যান, স্থূল রূপের পূজা ধ্যান জপ যজ্ঞাদি করে মনকে ত্রাণ বা আয়ত্ত্ব করার সাধন পদ্ধতি ও তদনুযায়ী প্রচেষ্টাকে মন্ত্রযোগ বলে। মন্ত্রময়ী দেবতার আরাধনা করতে করতে মনেরও লয় হয়। আমাদের এই স্থূলদেহ—জাগ্রত অবস্থা, সূক্ষ্ম দেহ—সপ্নাবস্থা ও কারণদেহ—সুষুপ্তি অবস্থা, এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে সাধক নিজ নিজ সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির গতি অনুসারে অলৌকিক, আধ্যাত্মিক নামময় শব্দ বা মন্ত্র আর ভাবময় রূপ অবলম্বন করে মুক্ত হন।

লয়যোগ—উক্ত উপায় দ্বারা সাধক নিজ সূক্ষ্মদেহের মধ্যে অভীষ্ট দেবতাত্মক চৈতন্যময় সত্তার মধ্যে বিন্দুর সূক্ষ্মতম স্বরূপের ধ্যান দ্বারা যে সকল লয়াদি কাজ হয় তাতেই তাঁর চিত্তবৃত্তিনিরোধ কারণদেহে লয় হয়ে যায়, এতে যে যোগসম্পদ ও মোক্ষলাভ হয় তাকেই—লয়যোগ বলে।

রাজযোগ—লয়যোগে অভ্যস্থ সাধক নিজ কারণদেহের অভিমানী আত্মা—প্রাজ্ঞরূপের সূক্ষ্মতম স্বরূপ প্রকৃত অহঙ্কার বা অবিদ্যারূপ সলিলে ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত অহংরূপ অস্মিতাত্মক অভিমানযুক্ত জ্ঞান পরমাত্মায় 'তৎ' বস্তুতে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দেবার জন্য যে সকল ক্রিয়া করেন তাকেই রাজযোগ বলে। এতে মন ও শরীর বায়ু নিশ্চল বা স্থির করে সমাধিস্থ হয়। হঠযোগই রাজযোগের সোপান। 'হ'কার ও 'ঠ'কার—চন্দ্র সূর্য্যের বা শিব ও শক্তির বোধক। শরীর বিশুদ্ধ না হলে হঠযোগ সাধন হয় না। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, ধৌতাদি

নানা প্রকার কৃচ্ছ সাধন দ্বারা শোধন করতে হয়। প্রকৃতি সাধারণ মানুষের শরীর ও প্রাণে যে ধর্ম্ম যে সামঞ্জস্য করেছেন হঠযোগী তা অতিক্রম করে প্রাণের মধ্যে এমন একটা উৎস খুলে দিতে চান যার সহায়তায় প্রকৃতির অজস্র অফুরন্ত প্রাণশক্তির ভেতরে বিপুল স্রোত বহন করে আনতে পারে, যার ফলে মানুষের অলভ্য, অপরিচিত নানাপ্রকার নূতন নূতন বৃত্তি খুলে যায়। সাধকের অদৃশ্য স্তর, অকল্পিত জগৎ, অদ্ভুত দৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ অত্যাশ্চর্য অলৌকিক শক্তি জন্মে। তারানাথ ব্রহ্মচারীও মার্কণ্ডেয় মুনি, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরখনাথ, জলন্ধর, চর্পটি, চতুরঙ্গী, বিচারনাথের ন্যায় আসনসিদ্ধি দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রার দ্বারা স্থিরতা, প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা, সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে ষট্‌চক্র ভেদ, প্রত্যাহার প্রভৃতি দ্বারা স্থৈর্য্য, ধ্যান ধারণার মধ্যে শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ করে সাধনার প্রভাবে মোক্ষলাভ করেছিলেন।

হঠযোগীর সাধনপ্রণালী সিদ্ধ বা হঠমার অবধূত ও সহজমার্গের সহিত অনেকটা সাধর্ম্ম্য আছে। সিদ্ধাইদের সাধনার আবার তিনটি পথ আছে। যথা—অবধূতি, চণ্ডালী ও বাঙ্গালী বা ডোম্বী। অবধূতিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে; চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে বললেও হয়, নেই বললেও হয়, আর বাঙ্গালী বা ডোম্বীতে কেবল অদ্বৈত ভাব—দ্বৈতের লেশমাত্রও নেই। এই মতের আদিগুরু নাথরূপী পরমেশ্বর। এক সময় এই নাথপন্থীরা এত প্রবল হয়েছিল যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়সম্প্রদায়ই নাথদের পূজা করতেন। এই নাথেরা বাঙ্গলাদেশের রাজাদের ও ব্রাহ্মণদেরও গুরু ছিলেন। এখনও বাঙ্গলাদেশের নাথযোগীগণ সকলেই নাথ-উপাধিধারী। নেপালে বৌদ্ধদের মৎস্যেন্দ্রনাথই প্রধান দেবতা। নেপালে এঁর পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার মতই খুব ধুমধাম করে রথযাত্রা হয়। যোধপুরে মহামন্দির নাথপন্থীদের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথকে এখনও তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ পূজা করেন। সাধক মৎস্যেন্দ্রনাথকে মীননাথও বলা হয়। ইনিই নাথপন্থের প্রবর্তক। 'কৌলজ্ঞান বিনিশ্চয়' মৎস্যেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট তন্ত্রগ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে একটি সাধন ইঙ্গিত এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট (পন্থ)।
কর্ম কুরঙ্গ সমধিক পাঠ ॥
কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা।
কমল মধু পিবিবি ধোকেন ভমরা ॥

গুরুর কৃপায় সাধকের হৃদয়-শতদল ফুটে উঠেছে, নিত্যই সে সেই কমলের মধুপান করবে, তাতে তাঁর অদ্বৈতবাদের আর কোন সন্দেহ থাকবে না। গোরক্ষনাথের আরও অনেকগুলি যোগ সম্বন্ধীয় বই আছে। যথা—গোরক্ষ সংহতি, গোরক্ষবিজয়, গোরক্ষশতক ও গোরক্ষকল্প' প্রভৃতি। 'হঠযোগ প্রদীপিকার একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হল।

মন থীরিতে পবন থীর, পবন থীরিতে বিন্দু থীর।
বিন্দু থীরিতে কন্দ থীর, বলে গোরক্ষদেব সকল থীর॥

ষট্‌চক্রভেদ যোগীদের অন্যতম প্রধান সাধন। অধঃশক্তি মূলাধারে আঁধার পথে ত্রিপুরাভৈরবীশক্তি দেবী কুণ্ডলিনী আছেন। তিনি সূর্য্য স্বরূপ ও বাসনাময়ী। এই কামরূপিণী কুণ্ডলিনীকে মূলাধার থেকে সহস্রারে উঠাতে পারলেই আর জন্মাতে হয় না। হংস জপও তেমনি আর একটি মুখ্য সাধনা। হংস মন্ত্র কি? এ সম্বন্ধে গোরক্ষ সংহিতায় বলা হয়েছে—

হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংস হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥

জীবাত্মাই সমস্ত সুখদুঃখ শোকতাপ আধি-ব্যাধি ভোগ করে। আমরা দিবারাত্র শ্বাস প্রশ্বাসে ২১৬০০ বার অজপা (স্বাভাবিকভাবে) গায়ত্রী হংস মন্ত্র জপ করছি। নিঃশ্বাস ত্যাগ করে নিতে না পারলেই মৃত্যু। তাং হং শিব বা মৃত্যুস্বরূপ। ইহা মোক্ষদায়িনী।

পূর্ব্বে বলেছি, হঠযোগীর মূল কথাই চন্দ্র সূর্য্য বা শিবশক্তিকে একীকরণ। এঁরা বলেন যে বৈষম্যই জগতের উৎপত্তি ও দৃশ্যমানতার মূলকারণ, যার থেকে জগৎ ফুটে উঠে। যতক্ষণ তার সাম্যাবস্থা থাকে ততক্ষণ জগৎ থাকে না। এটাই অদ্বৈত বা প্রলয় অবস্থা। সাম্যভঙ্গ হলেই বৈষম্য, দ্বন্দ্ব বা দ্বৈতভাবের উদয় হয়—ইহাই সৃষ্টি বীজ। দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি পরস্পরকে উপমর্দ্দন করে স্থিতিরূপে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে, তারা যখন সমত্ব ত্যাগ করে, যখন তাদের মধ্যে গুণপ্রধান ভাব জাগে তখন সৃষ্টি ও সংহার হয়। বহিঃশক্তির প্রাধান্যে সৃষ্টি আর অন্তঃশক্তির প্রাধান্যে সংহার হয়। স্থিতি দুই শক্তির সমানতার নিদর্শন। এই দুটি শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়। শিবশক্তি পুরুষপ্রকৃতি শব্দ মূলতঃ এই আদি দ্বন্দ্বেরই বাচক।

সাধক তারানাথ প্রায়ই নিম্নোদ্ধৃত গানটি ডাক্তার গঙ্গাধর দীর্ঘাঙ্গী মহাশয়কে গাইতে বলতেন।

জয় মা তারা আদ্যাশক্তি, জয় মা তারা তোমারি জয়,
তোমাতেই স্থিতি, তোমাতেই উৎপত্তি, তোমাতে জীবের হয় মা লয়।
জল-বিম্ব যথা জলেতে উঠিয়ে, ক্ষণতরে তাহে ভাসিয়ে ভাসিয়ে,
ভোগ অবসানে শক্তিহীন হয়ে পুনঃ সেই জলে মিশায়ে যায়॥
পূর্ণাশক্তি তথা তব-শক্তি বলে
জীবগণ ভবে চলে কলে, বলে।
সে শক্তির অভাব হ'লে মা ঘটে, মানুষ তারে মরণ কয়॥
কখন কি ঘটে, কিরূপ মা কর কিঞ্চিৎ মহিমা জানেন শঙ্কর,
তাই শিরে ধরি শম্ভু গঙ্গাধর, কখন পতিত পদে শবের প্রায়।
নৈশ সমীরণে প্রেম পরিচয়, ইশারা ইঙ্গিতে কি জানি কি হয়,
শাম্ভবী তারিণী তোমারই জয়॥
জ্ঞানানন্দ রূপে এ ঘটে আসিয়ে
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে অজপা জপিয়ে
হংস মন্ত্র শেষে উলটাইয়ে
সোঽহং হয়ে তোমাতে মিশায়ে যায়॥

৩। তারাস্তোত্র। মাতর্নীলসরস্বতী প্রণমতাং সৌভাগ্য সম্পদপ্রদে, প্রত্যালীঢ় পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে। ফুল্লেন্দীবর লোচনত্রয় যুতে কর্ত্রী কপালোৎপলে, খড়্গঞ্চদধতীং ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥ ১॥ হে মাতঃ নীলসরস্বতী! হে প্রণতজনের সৌভাগ্যসম্পদদায়িনী! তুমি শবরূপ শিবহৃদে দক্ষিণপদ প্রসারণ পূর্ব্বক বামপদ সঙ্কোচ করিয়া দণ্ডায়মান আছ। তুমি পদ্মাসনে ঈষৎ হাস্য করছ—চার হাতে কাটারা, কপাল, পদ্ম এবং খড়্গ ধরে আছ। তুমি জগতের আশ্রয়, ঈশ্বরী। অতএব, তোমাকে আশ্রয় করি। বাচমীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সর্ব্বার্থ সিদ্ধিরীশ্বরী নীলেন্দীবর লোচনত্রয় যুতে কারুণ্যবারাংনিধে, সৌভাগ্যামৃত বর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চত্বমস্মাদৃশম্॥ ২॥ হে বাগীশ্বরি! ভক্তগণের কল্পলতাস্বরূপে! হে সর্ব্বার্থসিদ্ধিরীশ্বরী! তুমি গদ্য প্রাকৃত ও পদ্যরচনা ও সর্ব্বজ্ঞতারূপ সিদ্ধি প্রদান কর, তোমার ত্রিনয়ন নীলপদ্মের ন্যায় শোভিত। তুমি করুণাসাগর, অতএব কৃপা করে সৌভাগ্যরূপ সুধাবর্ষণ করে আমাদের মত ব্যক্তিকে অভিষিক্ত কর। সর্ব্বে

বহরমপুরের উমাবনম্ আশ্রমে তারানাদের সমাধিমন্দির

গ্রন্থকারকে লিখিত পত্রে তারানাথের স্বাক্ষর

গর্ব্বসমূহ-পূরিততনো সর্পাদিবেশোজ্জ্বলে, ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিবীত। সুন্দরকটি ব্যাধূত-ঘণ্টাঙ্কিতে। সদ্য কৃত্তগলদ্রজঃ পরিলসন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজ, গ্রন্থিশ্রেণিনৃমুণ্ডদাম-ললিতে ভীমে ভয়ং নাশয় ॥ ৩ ॥ হে সর্ব্বস্বরূপে, হে সর্ব্বগর্ব্বপূর্ণদেহ ধারিণি ও সর্পাদি বেশে উজ্জ্বলরূপধারিণি! তুমি ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সুন্দর কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টা ধারণ করেছ, সদ্যশ্চিন্ন রক্তাক্ত দুই নরমুণ্ডের কেশদ্বারা মালা গেঁথে গলায় ধারণ করেছ। হে ভীমে! আমার ভয় নাশ কর।

মায়ানঙ্গ-বিবেক-রূপললনা বিন্ধ্যাদিচন্দ্রাত্মিকে, হুং ফটকারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ। মূর্ত্তিস্তে জননি ত্রিধা সুঘটিতা স্থূলাতি সূক্ষ্মাপরা, বেদানাং নহি গোচরা কথমপি প্রাপ্তুং নু তামাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥ 'তুমি মায়া ও অনঙ্গের বিবেকরূপ ললনা, তুমি বিন্ধ্যগিরির চন্দ্রতুল্যা, তুমি হুঁ ফট্‌কার রূপা ও মন্ত্র স্বরূপা হও। তুমি আমার মত ব্যক্তির আশ্রয়। হে জননি! তোমার মূর্ত্তি স্থূল অতি সূক্ষ্ম ও পরা, এই তিন রূপে বিভক্ত হয়েছে, বেদও তাহা জানে না। আমি কোনওরূপে পেয়ে সেই মূর্ত্তি আশ্রয় করলাম। ত্বৎপাদাম্বুজ সেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং, তস্য শ্রীপরমেশ্বরি ত্রিনয়ন ব্রহ্মাদিসাম্যাত্মনঃ। সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্, সুরান্ মাতস্ত্বৎ পদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে ॥ ৫ ॥ হে পরমেশ্বরি! পুণ্যবান্‌গণ তোমার পাদপদ্ম সেবা করে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন, ব্রহ্মা ও শিব সমান হয়েন। কিন্তু দেবেন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ তাঁকে সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত করতে চেষ্টা করেন, তবে মন্দবুদ্ধি মনুষ্য কি নিমিত্ত তোমার পদ সেবাতে বিমুখ হয়ে তাদের সেবা করবে। মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজ-দ্বয়রজো মুদ্রাঙ্ককোটিরিণ, স্তে দেবা জয় সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কেগতাঃ। দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে, তত্তুল্যাং নিয়তং যথা সুভিরমী নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥ হে মাতঃ! তোমার পদকমলরজতে গাত্র মুদ্রাঙ্কিত করে দেবগণ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তোমার ক্রোড়ে গমন করেন, কিন্তু তাঁদের ন্যায় কেহ কেহ আমি দেবতা, আমার সমান আর কেহ নেই—এই স্পর্দ্ধা করে নিয়ত প্রাণ হারিয়ে থাকেন।

ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা নতে, ভূতপ্রেতপিশাচ রাক্ষসগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ। দৈত্যাদানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো, ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকশ্চ মনুজা মাতঃ ক্ষণং ভূতলে ॥ ৭ ॥ তোমার নাম

স্মরণ করলে ভূত প্রেত পিশাচ, রাক্ষস যক্ষ নাগাধিপ দৈত্য, দানবরাজ, আকাশচারী, ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ, ডাকিনী ও কুপিত যমও পলায়ন করে, পৃথিবীতে তারা ক্ষণকালও তোমার নাম স্মরণকারী জনকে দেখতে সমর্থ হয় না। লক্ষ্মীঃ সিদ্ধিগণশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বারিণাং স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গণে গজঘটা স্তম্ভস্তথা মোহনম্। মাতস্তৃৎপদ সেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তে গুণাঃ, কান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ ॥ ৮ ॥ হে মাতঃ! তোমার পাদপদ্ম সেবা করলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। সিদ্ধগণ, অধোমুখ রুদ্রানুচরগণ, জলের সিদ্ধগণ বশীভূত হয়; ঐ ব্যক্তি শত্রুস্তম্ভ, যুদ্ধস্থলে গজস্তম্ভও মোহন করতে সমর্থ হয়। অধিক কি, সে কামকেও জয় করে এবং ক্ষুদ্র হলেও বৃহস্পতিতুল্য হয়।

৪। ভৈরব ও ভৈরবী—ভৈরব শিবাবতার আর ভৈরবী ঐ ভৈরবের সাধনসঙ্গিনী—দশমহাবিদ্যার একবিদ্যা। ইনি সকল দুঃখ নাশ করেন, যম যন্ত্রণা দূর করেন; তাই তাঁহার নাম ভৈরবী। সাধারণত গুরুপরম্পরায় এদের পরিচয় পাওয়া যায়। আদি ভৈরবীর সন্তানদের কৌলসম্প্রদায় বলা হয়। হরিবংশ গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়, মহামুনি দুর্ব্বাসা হতে আগমের প্রচার। তন্ত্রশাস্ত্রে আগম শব্দের তাৎপর্য্য এরূপ দৃষ্ট হয়। আ+গ+ম, এই তিন আদ্য বর্ণের সমন্বয়ে আগম শব্দ গঠিত। আ—শিবমুখ হতে আগত; গ—গিরিজাশ্রুতিগত; ম—বাসুদেব সম্মত, ইহাই আগম। আর নিগম শব্দটিও পূর্ব্বোক্তরূপে নি+গ+ম, আদ্য বর্ণত্রয়ের মিলনে উৎপন্ন। নি—গিরিজামুখনির্গত, গ—গিরীশশ্রুতিগত, ম—বাসুদেব সম্মত=নিগম, অদ্বৈতাদি তিনটি মার্গের পুনঃ প্রবর্ত্তন হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ দুর্ব্বাসা মুনির নিকট ৬৪ (চৌষট্টি) খানি অদ্বৈত নিগূঢ়তত্ত্বীয় তন্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই তিনটি মার্গের তিনটি মঠ ছিল। এছাড়াও আর একটি মঠের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটি হ'ল এই কামরূপ পীঠ। কৌলসম্প্রদায় এই সকল মঠের মঠাধীশ।

(৫) চক্রানুষ্ঠান—নিরুত্তর তন্ত্রের ১০ম পটলে এবং মহানির্ব্বাণ ও কুলার্ণব তন্ত্রে উল্লেখ আছে, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ বীরসাধক ও কৌলাচারী কুলযোগীগণই চক্রের অনুষ্ঠান করবেন। ব্রহ্মমন্ত্রে সিদ্ধ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ সাধককে চক্রেশ্বর করে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠানে ভৈরবীর উপস্থিতিতন্ত্রসম্মত। ভৈরবী বা নারী ব্যতীতও এই সাধনা উচ্চস্তরে সাধিত হয়। বামাচারী বামদেব এই ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠানে যোগদান করে চক্রেশ্বর পদ গ্রহণ করলেন—

উদ্দেশ্য ব্রহ্মচারী তারানাথকে কৌলাচার শিক্ষা দেওয়া। বীরাচারী সাধকদের সাধনা স্তরে ব্রহ্মকে উপলব্ধির সহায়ক হিসাবে চক্রের অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সাধনায় পাশ বা অন্তরায়—লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুল, শীল ও জাতি। এই অষ্টপাশ বা বিঘ্ন অপসারণ করার জন্য নানা রকম কৌশল ও ব্যবস্থা আছে। যতক্ষণ পাশবদ্ধ ততক্ষণ জীব, পাশ মুক্ত হলে শিব। বীরাচার থেকে দিব্যাচারে উঠতে বলে ভেদজ্ঞান থাকলে এই উন্নত অবস্থা দিব্যভাবে সাধক প্রবিষ্ট হতে পারবেন না। অষ্টপাশ ছিন্ন করে মনকে উদার অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে, জাত্যাভিমান ত্যাগ করে। নীচজাতীয় স্ত্রীপুরুষ রজকাদি সপ্ত জাতি ও উপেক্ষিত হাড়ী ডোম চণ্ডাল প্রভৃতিকে তাঁদের নিজ নিজ স্ত্রী বা পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে শক্তি সাধনায় চক্রানুষ্ঠানে গ্রহণ করতে হয়। এই অনুষ্ঠানে ভৈরব ও ভৈরবীর উপস্থিতি তন্ত্রসম্মত। চক্রানুষ্ঠানে চক্রাকারে যারা চক্রে বসেন তাঁদের মধ্যে কুমারীগণই শ্রেষ্ঠা; তাঁদের পূজা করতে হয়—চক্রের প্রভাবে তাঁরাই দেবীতুল্যা হন। চক্রের অবসানে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জন্ম (বৃত্তি) গত জাতিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই চক্রের নিয়মানুসারে শৈব-বিবাহের ব্যবস্থা আছে—এতে বয়স বা বর্ণ-বিচার নেই। নরনারী একত্রে ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা সহজাত মনোবৃত্তিগুলি সংযত করে ওগুলিকে ঈশ্বরাভিমুখী করে। একলা এই চক্রের অনুষ্ঠান হয় না। স্ব-শক্তি আটজনের বেশী চক্রে বসবার নিয়ম নাই। চক্রে বসতে হলে যোড়ে বা যুগলে সাধক ও সাধিকাকে চক্রাকারে বসিয়ে স্বীয় শক্তিসহ অর্চ্চনা করতে হয়। কপালে তিলকদান চুয়া-চন্দন গন্ধাদি দিয়ে অর্চ্চনা করতে হয়। প্রথমে দক্ষিণ দিকে গুরু-শক্তি তার দক্ষিণে গুরুকে বসিয়ে অপরাপর শক্তি-সাধকদের জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠক্রমে যথারীতি বসাতে হয়। গুরু পুত্র, গুরুভাই ও গুরুবংশকে বামে বসাতে নেই। প্রকৃতি ও পুরুষ দু'টি পৃথক সত্ত্বা নয়। দুটিকে একত্রিত হয়ে আপন আপন পূর্ণতা লাভ করার জন্য এই অনুষ্ঠান। অমানিশার ঘোরান্ধকারে মহানিশায় নির্জ্জন নিস্তব্ধতার নিভৃতে রূপযৌবন সম্পন্না, লাস্যময়ী যুবতী স্ত্রী বীরাচারী সাধকের মনে লালসা উদ্রেকের পরিবর্তে মহামায়া মহেশ্বরীর রূপ ধারণ করে। তখন সমস্ত লৌকিক জগৎ দৃষ্টিপথ থেকে সরে যায়, তখন আর বাসনা কামনা থাকে না—নরনারীর চিত্ত শুদ্ধভাবে সমর্পিত ও সমাধিস্থ হয়ে পুরুষ প্রকৃতি শিবশক্তির কামশূন্য মহাভাবের উদয় হয়। সাধক এই নারীমূর্ত্তির মধ্যে মহামায়া মা মহেশ্বরীর রূপ দেখেন, তখন দেহ মন কামবাসনা বিবর্জ্জিত হয়।

পঞ্চতত্ত্ব। মদ্য মাংস মুদ্রা ও মৈথুন দ্বারা দেবীর উপাসনা করতে হয়—বামে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, মুখে মদিরা, হস্তে পানপাত্র, মস্তকে গুরুচিন্তা, হৃদয়ে ভগবতীর ধ্যান জিহ্বায় মন্ত্রজপ। অনভিজ্ঞ লোকের ধারণা, মদ্য মাংসাদি পরস্ত্রী গমন প্রভৃতি যথেচ্ছাচারই বুঝি বা তন্ত্রসাধনার অঙ্গ। তারা জানেন না যে, ভোগ-প্রবৃত্তিগুলিকে ধীরে ধীরে বিধি-নিষেধের দ্বারাই বশীভূত করা তান্ত্রিক সাধনার উদ্দেশ্য—যেমন মদ্যপকে মদ্যপান ত্যাগ ও স্ত্রৈণকে স্ত্রীলোকে আসক্তি ত্যাগ। ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয় তাহাই মদ্যপান-মদ্যসাধনা। বাক-সংযমী অর্থাৎ মৌনী থাকাই—মাংস সাধনা; প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করে মনকে নিশ্চল করাই—মৎস্য সাধনা। মূলাধার থেকে কুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগসাধন দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদ করে মস্তকে সহস্রদল-কমলে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত মিলিত করার নাম মৈথুন। তন্ত্রশাস্ত্রের শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ না জেনে তন্ত্রসাধন পদ্ধতিতে অপ্রবিষ্টগণ মৈথুন শব্দের কদর্থ করেন স্ত্রী-সম্ভোগ। তন্ত্রে স্ত্রী-সম্ভোগ ত দূরের কথা, স্ত্রীজাতির প্রতি কোন প্রকার অপমানসূচক বা অশালীন কথা বলাও অপরাধ। চক্রে স্বকীয়া শক্তি বা স্ত্রীতে সংযমী হতে হয়। কামনা-বাসনা বহ্নির সমতায় গভীর সত্তার ঊর্দ্ধশক্তি ভক্তির উন্মেষ হয়—জ্ঞানে প্রতিষ্ঠা, ভক্তি হৃদয়ের বিশুদ্ধতা আনায়ন করে। ভক্তির স্ফুরণে আসে হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও আনন্দ আর মহাশক্তির উন্মেষ। এই মহাশক্তি বদ্ধসৃষ্টি ছিন্ন করে জ্ঞানের উদার স্থিতি ও প্রশান্তিতে দেয় প্রতিষ্ঠা—ইহাই মৈথুন।

৬। শিমূলতলা—বামদেব বলতেন শিমূলতলার আশ্চর্য্য মাটি। তারা-মা আমার শ্মশানবাসী। বাহ্য শ্মশান ঐহিক লীলার শেষাঙ্কের রঙ্গভূমি—এখানে রাজাপ্রজা-ধনীনির্ধনী পণ্ডিতমূর্খ সাধু অসাধু, নরনারী শিশুর একই গতি। এখানকার দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ে বৈরাগ্য ও ধর্ম্মভাব জাগে। দেহের নশ্বরত্ব দেখে ক্ষণিকের জন্য হলেও শ্মশানবৈরাগ্য উদ্রিক্ত হয় জীবের হৃদয়ে। এই শিমূলতলায় বশিষ্ঠের বেদীতে বসে ধ্যান ধারণা করলে সহজেই একাগ্রতা আসে। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে প্রত্যয়ৈকতানতা বা একরূপ ভাবনা বলে। মনের একাগ্রভূমিতে কোন বস্তু নিয়ে ধ্যান আরম্ভ হয়। ভাবনা দৃঢ়ীভূত হ'লে জ্ঞাতাজ্ঞেয় জ্ঞান-জ্ঞেয়ে পরিণত হয়। তখনই ধ্যানকে ধারণা বলা যায়। এই একমাত্র জ্ঞেয়াবলম্বন ধারণা ক্রমশঃ সমাধিভাবাপন্ন হয়—সমস্ত চিত্ত-বৃত্তিও নিরোধ হয়। তন্ত্রে এই সমাধিদশার অবস্থাকে অজ্ঞাতমণ্ডল বলে—কারণ তখন জগতের জ্ঞান ডুবে গিয়ে আত্মা কি এক অজ্ঞাত জগতে বিচরণ

করে। তন্ত্রের পঞ্চচক্র পর্য্যন্তই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোমের লীলা—ষষ্ঠে মনের লয়, সপ্তমে রূপ ভাবাতীত শূন্য। মন ষট্‌চক্র ভেদ করে সপ্তম চক্রে না উঠলে এ অবস্থা হয় না। বৌদ্ধতন্ত্রে এই অবস্থাকে নির্ব্বাণ বলে। এই অবস্থার পর অখণ্ড সত্তার অখণ্ড জ্ঞান ভাসে—ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে মন বুদ্ধি অহং-জ্ঞানের লয় অবস্থাই অন্তঃশ্মশান। শ্মশানেই তারা বা ত্রাণকারিণী বিদ্যায় স্ফুরণ হয়। এই শিমূলতলায় মহাত্মা বশিষ্ঠের সিদ্ধাসনে বসে থাকতে থাকতে আপনিই মনে শূন্যভাব জাগে।

৭। অভিষেকের আবশ্যকতা—নিরুত্তরতন্ত্র ও বামকেশ্বর তন্ত্রে উল্লিখিত আছে, অভিষিক্ত না হয়ে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দীক্ষা গ্রহণ করেই কুলধর্ম্ম বা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পূজার্চ্চনাদি করেন এবং সকলকে অভিষেক ব্যতীত সিদ্ধবিদ্যা মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন, তিনি চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরক ভোগ করেন।

বামকেশ্বর তন্ত্রের পঞ্চাশত পটলে দৃষ্ট হয়—শাক্তাভিষেক তন্ত্রসাধনার প্রথম অধিকার; দ্বিতীয়ক্রম—পূর্ণাভিষেক, তদনন্তর ক্রমদীক্ষাভিষেক, সাম্রাজ্যাভিষেক মহাসাম্রাজ্য বা মহাপূর্ণাভিষেক ইত্যাদি দীক্ষাও ব্যবস্থিত রয়েছে। আজও বঙ্গের গঙ্গাসাগর সমীপে নিভৃত অব্যক্ত প্রাচীন মঠে উক্ত সাধন-পদ্ধতি অতি সংগোপনে সংরক্ষিত আছে। বঙ্গদেশই তান্ত্রিক সাধন ও শিক্ষার মূলপীঠ বা কেন্দ্রস্থল।

গুরুর আশীর্ব্বাদ ও তৎ কর্ত্তৃক অভিষেকরূপ সাধনশক্তি প্রয়োগ বা দৈবী আন্দোলন ব্যতীত কিছুতেই সাধনমার্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সেজন্যই এই অভিষেক প্রথা। অভিষিক্ত না হলে কুলকর্ম্ম, উপাসনা বা সাধনভজন ফলপ্রদ হয় না। দীক্ষার প্রভাবে সাধকের সঞ্চিত অশুভ কর্ম্মফল নষ্ট হয় ও সঞ্চিত শুভকর্ম্মসমূহের অনিমাদি অষ্টসিদ্ধিতে পর্য্যবসান হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করতেই হয়। প্রারব্ধ ফল দেহ-ভোগাবসানে শেষ হ'লে দীক্ষিত সাধক ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন। সেখানকার ভোগ সমাপ্ত হলে ভোগবাসনা অতৃপ্ত থাকলে ঐ বাসনার অনুরূপ ভোগের জন্য লোকান্তরে নীত হয়। এইরূপে শুভকর্ম্মের ফলে বৈরাগ্যের উদয় হয়।

দ্বৈত অদ্বৈতবাদের মূলাধার গুরুকরণ ও প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ করে প্রত্যেক সাধককেই সাধনপথে অদ্বৈতসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হতে হবে। এই দীক্ষা কুলগুরুর নিকট নিতে হবে। এখানে কুল অর্থ বংশ নহে, কুল অর্থ ব্রহ্ম বা

ব্রহ্মশক্তি। কুলদীক্ষা, কুলপদ্ধতি, কুলকুণ্ডলিনী, কৌল ও কুলীনাদি শব্দ একমাত্র ব্রহ্মশক্তিকে বুঝায়। কুলগুরু অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মশক্তি-জ্ঞানপুষ্ট গুরুকে বুঝায়। গুরুবংশে বংশপরম্পরায় কালীতারাদি সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞ দিব্য বা সাত্ত্বিক শক্তি থাকে—দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সাধন-সামর্থ্য দেখতে পাওয়া যায়।

বাম সম্প্রদায়ের দীক্ষা লৌকিকী নয়, ষোড়শোপচারে পূজা হোমাদির প্রয়োজন হয় না। আগমশাস্ত্রে পরমাত্মা শিব তিন প্রকার দীক্ষার উপদেশ দিয়েছেন—যথা, শাম্ভবী শাক্তী ও মান্ত্রী। শাম্ভবী দীক্ষায় শ্রীগুরু দর্শন, স্পর্শন বা সম্ভাষণ প্রাণায়ামাদি মাত্রেই জীবের তৎক্ষণাৎ জ্ঞানোদয় হয়। শাক্তী দীক্ষায় দিব্যজ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট গুরু দিব্যজ্ঞান সহায়ে শিষ্যের ভিতর নিজশক্তি প্রবিষ্ট করিয়ে তাহার প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করে দেন। মান্ত্রী দীক্ষায় মণ্ডল এঁকে ঘটস্থাপন ও দেবতার পূজাদি করে শিষ্যের কানে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্র দিতে হয়। তারানাথ বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণের উপনয়ন সময়ে বেদ-মাতা গায়ত্রী মন্ত্রের যে দীক্ষা হয় উহা শ্রেষ্ঠ দীক্ষা। ব্রাহ্মণদের স্বতন্ত্র কর্ণশুদ্ধি দীক্ষার দরকার হয় না, একেবারেই তাদের শাক্ত্যাভিষেক হতে কাজ আরম্ভ হয়। শূদ্রাদির হরিনাম মন্ত্রে কর্ণশুদ্ধি হয়। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক দরকার।

৮। কলেশ্বর ও কপিলেশ্বর শিবতীর্থ—চন্দ্রচূড় নামে একখানি প্রাচীন বই থেকে জানা যায় যে বীরভূমের মধ্যে ঢেকার রাজা রামজীবন রায় তপস্যা করার উদ্দেশ্যে একবার যোগেশ্বর নামে শিব মন্দিরে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন—কলেশ্বর গিয়ে তপস্যা কর। তিনি কলেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে দৈববাণী শুনলেন, ভাগীরথীর তীরে এক কণ্টকময় বনে কপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে এক শিবলিঙ্গ আছেন। পদ্ম নামে মহানাগ ওকে রক্ষা করছে। তুমি সেই কপিলেশ্বর তীর্থে গিয়ে তপস্যা কর। একদিন রাত দুপুরে রামজীবন কাউকে কিছু না জানিয়ে রাজধানী ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে হঠাৎ একজন খর্ব্বাকৃতি (বেঁটে) ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত গভীর রাতে এখানে কি জন্য এসেছ? তুমিই বা কে? রাজা তার স্বপ্নাদেশ দৈববাণীর কথা ব্রাহ্মণকে জানালেন। ব্রাহ্মণ কিছু না বলে শুধু আঙুল দিয়ে ইশারায় সেই জায়গাটি দেখিয়েদিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রাজা চোখ ফিরিয়ে আর ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন না। তিনি হা-হুতাশ করে বলতে লাগলেন—হায়, হায়! পেয়েও হারালাম! দুঃখে অভিভূত হয়ে রাজা দু'দিন দু'রাত নিরম্বু উপবাস করে সেখানে অবস্থান করেন। ছয় দিন পূর্ব্বের স্বপ্নাদেশের পরে রাজা পুনরায় স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, কলেশ্বরে গিয়ে এক মন্দির তৈরী ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। এই মন্দিরটির ন'টি চূড়া আজও বর্ত্তমান। এদিকে রাজার মন্ত্রী আর দেওয়ান কালিদাস বিশ্বাস রাজাকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে চারিদিকে লোক পাঠান; নিজেরাও লোকজন নিয়ে রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজা রামজীবন তাদের তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা বলেন, আর তাদেরকে এখানে মন্দির তৈরী করে দিতে আদেশ দিলেন। যথাসময়ে মন্দির তৈরি হল। মাটি ফুঁড়ে মন্দিরের মধ্যে শিব আপনিই উত্থিত হলেন। এভাবেই কলেশ্বর শিবের উৎপত্তি হয়। কলেশ্বরের সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচলিত আছে, কলেশ্বরের পূর্ব্ব নাম ছিল পার্ব্বতীপুর—ঢেকা থেকে এক ক্রোশ উত্তরে। স্থানটি পূর্ব্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। কথিত হয়, এখানে কলাসুর নামে এক অসুর বাস করত। কলেশ্বরের কাছেই বিল্বগ্রাম বা বেলগাঁয়ে বিল্বাসুর নামে আর এক অসুর বাস করত। কলাসুর ছিল পার্ব্বতীর ভক্ত এবং বিল্বাসুর ছিল শিবের ভক্ত। কলাসুরের এক মেয়ে ছিল—নাম তার কলাবতী। এই কলাবতী ও বিল্বাসুরের মধ্যে প্রণয় হয় বিল্বাসুর বিবাহ করার জন্য তাকে হরণ করে বেলগ্রাম লুঠ করে। ফলে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। বহু বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। অবশেষে হরগৌরী এসে এদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেন। এরা দুজনে বর চান, হর পার্ব্বতীকে এখানে চিরকালের জন্য অধিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং শিবের নাম হবে কলেশ্বর। সেই থেকে এখানে কলেশ্বর শিব বর্ত্তমান আছেন। শিব মন্দিরের পূর্ব্বদিকের পার্ব্বতী মন্দির প্রাকৃতিক বিপ্লবে ধ্বংস হয়ে যায়। এই অসুর যুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে কলেশ্বর ও বেলগ্রামের লোকেরা প্রতি বছর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর দিন একটি কৃত্রিম যুদ্ধের অনুষ্ঠান করত। এতে বহুলোক হতাহত এবং খুন জখমও হত। এজন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্ট এই যুদ্ধানুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। [বীরভূম বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড]

৯। কিরীটেশ্বরী—বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ সহরের ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ডাহাপাড়া সাধু জগৎবন্ধুর আশ্রম থেকে আধক্রোশ পশ্চিমে একটি

ক্ষুদ্রপল্লী দেখতে পাওয়া যায়, উহার নাম কিরীটকণা। স্থানটি এখন প্রায় জঙ্গলময়, শান্তির নিকেতন। মুর্শিদাবাদের মধ্যে এরকম বৈরাগ্যোদ্দীপক স্থান অতি বিরল। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে—তার মধ্যে মুর্শিদাবাদের অধিষ্ঠাত্রী কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দির অন্যতম। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় মঙ্গল বৈষ্ণব ও তার পূর্ব্বপুরুষগণ দেবীর সেবক ছিলেন। কানুনগো দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর গুপ্তমঠ নামে প্রাচীন মন্দির সংস্কার করে ভৈরবের মন্দির নির্ম্মাণ আর কালীসাগর নামে একটি বৃহৎ দীঘি খনন করে দেন (মুর্শিদাবাদ কাহিনী)। মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের অদূরে বড়নগরে নাটোরেশ্বরী পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনী রাজরাজেশ্বরীর মন্দির ও পঞ্চমুণ্ড আসন এবং শিব মন্দির। একদা এখানে দিনের বেলায় গৃহযোগী রাজা রামকৃষ্ণ বড়নগরে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনা করতেন আর রাত্রিতে সাধনভজন চলত কিরীটেশ্বরী মন্দিরে (মুর্শিদাবাদ কাহিনী: শ্রীনিখিলনাথ রায়)।

১০। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাশ অধ্যায়ে তৃতীয়, চতুর্থখণ্ডে আরুণেয় শ্বেতকেতু ও পাঞ্চালরাজ প্রবাহনের পঞ্চপ্রশ্নাত্মক আখ্যায়িকায় পঞ্চাগ্নি বিদ্যার বর্ণনা আছে। দ্বিজাতির পক্ষে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান আছে। এই যজ্ঞে প্রধানতঃ সকাল ও সন্ধ্যায় অগ্নিতে আহুতি দেবার নিয়ম। মধ্যাহ্নকালে আহুতি কর্মীর ইচ্ছাধীন। অগ্নিহোত্রী ব্যক্তির মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত আহুতি দ্বারা অন্তরীক্ষাদি লোক-পরম্পরাক্রমে পিতৃলোকে গমন করে। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আবার দ্যুলোক পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচটি পদার্থের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রাণীদেহ লাভ করে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ছাড়াও ঐ পাঁচটি পদার্থকে যদি অগ্নিরূপে কল্পনা করে উপাসনা করা যায়, তা হ'লে উপাসক পিতৃলোক-প্রাপক দক্ষিণায়নের পরিবর্ত্তে উত্তরায়ণ পথে গমন করে। এই জাতীয় সাধনাকে কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা বা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বলে।

১১। মণিকর্ণিকার ক্ষেত্র—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রদেব মণিকর্ণিকায় স্নান করবার নিত্য প্রয়াস পান। তাঁদের মধ্যে রুদ্র অনেকবার ডুব দিলেন কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ভাগ্যে ডুব দেওয়া হল না। তাঁরা অনেকবার জল স্পর্শ করলেন মাত্র। এই কল্পের প্রথমে চিন্ময়ী মহাদেবী রুদ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে কারণবারিতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে বিরাট রূপ ধারণ করেন। রুদ্র

দেখতে পেলেন, সুষুম্নাতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ও কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। দেবীর অনাহত পদ্মে আগম-নিগম প্রভৃতি শব্দব্রহ্মমূর্ত্তিও দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন, শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তির আগম পরমাত্মা, বেদাঙ্গ সঙ্গে চতুর্ব্বেদ জীবাত্মা, ষড়দর্শন ইন্দ্রিয়, মহাপুরাণ উপপুরাণ শরীর, স্মৃতি কর ও অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আর অন্যান্য শাস্ত্র তাঁর কেশ।

দেবীর হৃদয়পদ্মদলে তেজোময়ী মহাকালীকে দেখতে পেলেন। রুদ্র দেবীর পদ্মে কোটিসূর্য্যচন্দ্রের ন্যায় ভাস্বর আগম দেখলেন। ঐ আগম মায়ানাশক—সর্ব্বধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বসিদ্ধি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রদান করে। রুদ্র মহাকালের প্রসাদে বেদবেদান্ত পুরাণ স্মৃতি ও অপরাপর শাস্ত্রসমূহ অধিগত করলেন। পরে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রের কাছে আগম-নিগম বিষয়ে জ্ঞান পেয়েছিলেন। এই শিবকাশীর মধ্যে মণিকর্ণিকা উত্তমোত্তম, সেখানে মুক্তিদাতা বিশ্বেশ্বর আছেন। তিনি সর্ব্বপাপনাশনক্ষম দেবতাদেরও দুর্ল্লভ মোক্ষ প্রদান করেন।

১২। তন্ত্রমত—প্রাচীন যোগী ও ঋষিগণ বিভিন্ন শাস্ত্রাদিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে যা যা নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন তন্ত্রেরও তাই অভিমত। তবে তন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, ইহা কোন জাতি বা সমাজ বিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়নি। ইহাতে সকল জাতিরই ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ-নির্দ্দেশ করা হয়েছে। তন্ত্রমতে যাঁরা দীক্ষা ও উপদেশ পেয়ে ব্রহ্মবিদ্যা সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেন তাঁরা স্ত্রীলোক হউন বা পুরুষই হউন অথবা যে কোন জাতিরই হউন, তাঁদের পার্থিব স্ত্রী-পুরুষের ভেদমূলক স্থূল দেহাভিমান ও জাতিবর্ণ অভিমানাদি কিছুই থাকে না। সমস্ত অভিমানাদি রহিত হয়ে তাঁরা এক নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। ঐ ভাবযুক্ত ব্যক্তিকে 'শিব' বলা হয়। তন্ত্রের চরমজ্ঞান 'শিবোঽহং' আর প্রার্থনীয় বা লক্ষ্য পরামুক্তি বা মোক্ষ। এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সাধনসাপেক্ষ। চিত্তবৃত্তি নিবৃত্তিই সমস্ত সাধনার মূল উদ্দেশ্য। তবে ইহা কেবল কঠোরতা বা কৃচ্ছ্রতা দ্বারা হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিযোগের সংমিশ্রণও দরকার হয়। পুরাকালে যারা ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে থেকে বেদাদি পাঠ করে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা লাভ করত, তারা সকলেই 'ভক্ত' ছিলেন। গুরুই তাদের উপাস্য ছিল। গুরুভক্তি দ্বারা গুরুর মধ্য দিয়ে তারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হতেন। সকল মানুষের রুচি ও মানসিক শক্তি সমান নহে। ফলে মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। তাই তন্ত্রশাস্ত্র সত্ত্ব রজ তম—এই গুণত্রয়ানুযায়ী মানুষকে পশু বীর ও দিব্য এই তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছে।

প্রাথমিক অবস্থায় তন্ত্র কঠোরতা, সংযম, পূজাপাঠ, গুরুসেবা, ধ্যান ধারণা অভ্যাস করা প্রভৃতি উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়েছেন, ইহাকে পাশবকল্প বা পশ্বাচার বলে। পশ্বাচার প্রথমে অবলম্বন না করলে কোন আচরণ স্থির বা সংযতভাবে আচরিত হয় না, চিত্তবৃত্তিরও নিবৃত্তি হতে পারে না। এজন্যই ভক্তিযোগবিশিষ্ট হয়ে নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করে পশ্বাচারে গুরুর উপদেশ মতই চলতে হয়। তারপর গৃহস্থ হবার ইচ্ছা থাকলে, যিনি এই পশুভাবে শ্রদ্ধাবান তিনি ঐ নিয়মে থেকে ভক্তিপন্থা অনুসরণ করে ভক্তিসম্ভূত জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। বৈষ্ণব রঘুনাথ দাস, যবন হরিদাস, হনুমান প্রভৃতি প্রথমাবস্থায় পশ্বাচারী হয়ে তীব্র কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রতার পথ ধরে দিব্যাচারে প্রবেশ করে ভক্তিযোগ-সিদ্ধ হয়েছিলেন। আর যারা পশ্বাচারে কঠোরতা পালনে অক্ষম তাঁরা স্মৃতি-সম্মত বিধিমত পশু ও বীর এই মিশ্রভাব অবলম্বন করে গুরুবাক্যানুসারে জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন। যাদের মধ্যে রজগুণের প্রাধান্য—যারা যোদ্ধা, তারা বীরভাব ও জ্ঞানযোগ দ্বারা সিদ্ধ অথবা যারা একেবারে সংসার বা ইহ জগৎকে অস্বীকার করেন তাঁরা কেবল জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হন। তন্ত্রে দিব্যভাবই চরমভাব। যিনি যে আচারই ধরে থাকুন, শেষে নির্ম্মল চিত্ত হয়ে দিব্যাচারে প্রবেশ না করলে ফললাভ হয় না। অভক্তের বা অবিশ্বাসীর কোন আচার অবলম্বনেই ফল লাভ হয় না। ভক্তি বিশ্বাস আর তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত সদ্‌গুরুই তান্ত্রিক বা বৈদিক সাধনায় সিদ্ধি দিতে পারেন। তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রের সকল বিধিরই চরম ফল—ব্রহ্মপ্রাপ্তি। বিশেষ এই যে, ভক্ত ভগবানকে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে লাভ করেন আর জ্ঞানী আত্ম-পর প্রত্যেকের আত্মাতেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার দর্শন পান। ফলকথা, গীতায় ভগবান যা বলেছেন উহাই সারবস্তু। বিবিধ শাস্ত্রের বিবিধ পন্থা, প্রত্যেকেরই মূলতত্ত্ব—ভক্তি বিশ্বাস ও ভগবানে আত্মসমর্পণ করা। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হয়েছে যে সত্ত্ব রজ ও তম গুণানুযায়ী অধিকার নির্ণীত ও অবস্থা ভেদ হয়ে থাকে। তন্ত্রে বিবিধ প্রকার ক্রিয়াদির বিবিধপ্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। যাগযজ্ঞ ও ব্রতাদিতে পুণ্য ও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু সাধনপথ ছাড়া মোক্ষ লাভ হয় না। তন্ত্রমতে যতক্ষণ জীব ও ব্রহ্মে ভেদ-জ্ঞানের অনুভব থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যে-কোন একটি পন্থা বা পথ অবলম্বন করে সাধনপথে রত থাকতে হবে। যখন জীব ও ব্রহ্ম অভেদ অনুভূত হয়ে প্রতি বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন হয়ে থাকে, সেই অবস্থাকে দিব্যভাব বলে। দিব্যভাবে সিদ্ধ হলে জীবন্মুক্তি

লাভ হয়, আর ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে এক অখণ্ডভাব প্রাপ্ত হন। ভক্ত 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের ভাব নিয়ে সেই জ্ঞানে আত্মসমর্পণ করে ভগবানের মধ্যেই বিশ্বদর্শন করেন আর জ্ঞানীগণ 'সোঽহং' এই মহাবাক্যের ভাব নিয়ে নিজের ও অপরের এবং বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতেই ভগবদ্দর্শন করে থাকেন। ভক্তেরাও জ্ঞানী, জ্ঞানীরাও ভক্ত। জ্ঞানীগণ প্রথমে জ্ঞানের পথ ধরে হন জ্ঞানী আর ভক্তগণ প্রথমে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অবলম্বন করে অবশেষে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হন। ভক্ত ভগবানের মধ্যেই জগৎ এবং জ্ঞানী জগতের মধ্যে ভগবান দর্শন করেন। তন্ত্র এই দু'য়ের একটি পথ ধরে ভগবানের বা ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা লাভেরই নির্দ্দেশ দেন। আমাদের তারানাথবাবা বলতেন— আজকাল তন্ত্রের ব্যাভিচার চলছে, কতকগুলি স্বার্থান্বেষী শিশ্নোদরপরায়ণ পিশাচসিদ্ধ লোক কিছু লোককে বিভূতি দেখিয়ে সাম্প্রদায়িক দল গঠন করে ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, ক্ষণিক আনন্দপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে। তিনি এদের বলতেন 'আপা পন্থি'। তারানাথ তন্ত্র বেদ পুরাণ ও যোগের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। বৈদিকের কর্ম্মবাদ, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ, পুরাণের ভক্তিবাদ এবং যোগশাস্ত্রের আত্মবাদ—জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়। তন্ত্রে শব্দ বা নাদ ও জ্যোতিঃ যেরূপ সাধনার প্রধান অঙ্গ তদ্রূপ বৈদিক সাধনারও প্রধান অঙ্গ। বৈদিক সাধনা উপনিষদ যুগে ছিল জ্ঞানপ্রধান, পৌরাণিক যুগে ভক্তিপ্রধান। কিন্তু তন্ত্রানুগ সাধনায় বেদের আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞগুলি সংক্ষেপ করে আধ্যাত্মিকতার দিকে তন্ত্র প্রখর ও তীব্র দৃষ্টি রেখেছে। তন্ত্র জীব ও শিবের মধ্যে এবং জীব ও আদ্যাশক্তির মধ্যে কোন স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-রেখা অতিক্রম করে দেখেছেন স্বরূপত এক অভেদ তত্ত্ব। তন্ত্র জগতকে মিথ্যা বলেনি। তন্ত্রের মতে জীবভাব সত্য এবং এই বিশ্বরচনা সেই এক অদ্বিতীয় শিব-শক্তি হ'তে উদ্ভূত। এই চরমতত্ত্ব সৎ স্বরূপ চিৎ বা চৈতন্য স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ—সৎ চিৎ আনন্দ—সচ্চিদানন্দরূপা। লোকে তাঁকে কালী তারা শিব দুর্গা রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে যে অদ্বিতীয় চৈতন্য-সত্ত্বা, তার নাম শিব। তত্ত্বদর্শী সাধকগণ শিবশক্তি বা নিত্যস্বরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির একাত্মতাকেই ব্রহ্ম বলেছেন। সাধনার বিভেদ বা প্রকার ভেদ শুধু সাধন-পদ্ধতির পঞ্চাবয়ব নিয়ে। মূলতঃ শ্রুতির উপাসনাকাণ্ডের সঙ্গে তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতির যথেষ্ট মিল দেখা যায়।

পঞ্চাবয়ব	বৈদিকসাধনক্রম	বৈষ্ণবসাধনক্রম	শক্তিসাধনক্রম
১।	প্রাণায়াম	শান্ত	মদ্য
২।	প্রত্যাহার	দাস্য	মাংস
৩।	ধ্যান	সখ্য	মৎস্য
৪।	ধারণা	বাৎসল্য	মুদ্রা
৫।	সমাধি	মধুর	মৈথুন

১৩। গায়ত্রী ও তন্ত্রানুষ্ঠান রহস্য—গায়ত্রীর উপাসনাই ব্রহ্মশক্তির উপাসনা, বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়কেই গায়ত্রীর উপাসনা করতে হয়। গান আর ত্রাণ—গায়ত্রী। কে কাকে ত্রাণ করে, যে গান করে তাকে ত্রাণ করেন গায়ত্রী। গায়ত্রী কে? সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তার বরণীয় ভর্গ (তেজ)—ভর্গই মহাশক্তি...উপাসনীয় শক্তি। শক্তি অলক্ষ্য বা ইন্দ্রিয়াতীত। এই শক্তির কাজ দু'রকম। শক্তি অংশে এক হলেও কার্য্যভেদে দুই। একের নাম প্রবৃত্তি, অপরের নাম নিবৃত্তি। ইহা একদিকে দৃশ্য-প্রপঞ্চ প্রকাশ করে—ইহা পাপপথ, আবার অন্যদিকে এই ভর্গ ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী—বিষয়াতীত পরমপদের দিকে প্রবাহিত! এ'টি ইহার কল্যাণ পথ। আপ, জ্যোতিঃ, রস, প্রাণ বা অমৃত সকলের ভেতর থেকে ইহা ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ব্যাপ্ত ওঁকার। ভর্গ একমূর্ত্তিতে ঘোরা—রজস্তমভাবে দৃশ্য প্রপঞ্চে প্রকট, অন্যভাবে অঘোরা—শান্ত সত্ত্বভাবে ঊর্দ্ধমুখে প্রবাহিত। শক্তির বাহিরে প্রকাশমান প্রবাহটিকে ত্যাগ, আর ভেতরের প্রবহমান প্রবাহটি উপাসনীয়। ইন্দ্রিয়গুলি অন্তর্মুখী হ'লেই একসঙ্গে মিলিত হয়, আর বাইরে এলেই এরা পৃথক সত্ত্বারূপে প্রপঞ্চিত। একসঙ্গে মিলিত হলেই বরণীয় ভর্গ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখা দেয়; তখন আমরা ধ্যানের বস্তু পাই। এই বরণীয় ভর্গই সকল সম্প্রদায়ের দেবতা, কুলদেবতা,—কুলমন্ত্র। কুলগুরু ঠিক থাকলেই সহজেই সাধনা হয়। সাবিত্রী গায়ত্রীর আরাধনায় ত্রি-সন্ধ্যায় তিন রকম ধ্যান বেদ ও আগমে উক্ত আছে। সকালে দেবী সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হয়ে ব্রাহ্মীরূপে জগতে নিত্য নূতন নূতন প্রবৃত্তির বিকাশ করছেন। মহাশক্তির প্রকৃষ্ট বিকাশ সূর্য্যমণ্ডলে দেখা যায়, বেদাগমে তারই মধ্যে দেবীর ধ্যান করবার ব্যবস্থা আছে। সূর্য্যমণ্ডল 'অরুণ' সারথি দ্বারা পরিচালিত সাতটি অশ্বযুক্ত রথে বিচরণ করেন। সূর্য্যকিরণ মূল তিনটি বর্ণের সমষ্টি মাত্র। এদের পরস্পর মিলন দ্বারাই সূর্য্যের সাতটি বর্ণ—সপ্ত অশ্ব। এই তিনটির প্রথমটি সকালে কুমারী বালিকা-মূর্ত্তিতে লাল কাপড় পরিধানে বসে আছেন। আদ্যা-ব্রহ্মশক্তি বা ইচ্ছাশক্তি রক্তবর্ণা—রক্ত অর্থে

রজোগুণান্বিতা হয়ে প্রতিদিন সকল বস্তুর অন্তর মধ্যে নূতন নূতন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করছেন। কোন বীজই রজঃ বা রস সংযুক্ত না হলে মোটেই অঙ্কুরিত হয় না। এই ব্রহ্মযোনী আদ্যার 'আদি রজঃ' থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ব্রাহ্মীশক্তি রজোগুণে গুণান্বিতা হয়ে প্রতিদিন চরাচর সকল বস্তুর অন্তরে নূতন নূতন প্রবৃত্তি সৃষ্টি করছেন। প্রতিদিন সকালে পূরকে নাভির পেছনে 'মণিপুর' চক্রের উপরে রক্তকমলে কেবল লালবর্ণ ব্রহ্মাণীকে চিন্তা করলেই মানুষের অবসাদ দূর হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, কর্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি উদ্বোধিত হয়—দেহ, মন সতেজ ও স্ফূর্তিযুক্ত হয়। মধ্যাহ্নে গায়ত্রীদেবী—বেদ ও আগমের মতে বৈষ্ণবী বা বিষ্ণুরূপিণী, নীলবর্ণা। পুষ্টিশক্তি পালনরতা যুবতী গরুড়বাহনা। এভাবেই নিত্য ধ্যান দ্বারা আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক পুষ্টি হয়। হৃদয়ের পেছনে 'অনাহত' চক্রের উপর কুম্ভকে নীলপথ বা নীলবর্ণা বৈষ্ণবীকে চিন্তা করলেই আমাদের পিত্তধাতুর শান্তি হয়, দেহ স্নিগ্ধ হয়ে পিত্তজ ব্যাধির উপশম হয়। সন্ধ্যায় সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে বৃদ্ধা বৃষভবাহিনী দেবীর ধ্যান নিবৃত্তিভাবব্যঞ্জক। শুভ্রবর্ণা জ্ঞানপ্রকাশক দেবী মাহেশ্বরী বা মহাসরস্বতীর 'আজ্ঞা' ক্ষেত্রে চক্রের রেচকে কপালের পেছনে শ্বেতপদ্ম চিন্তা করলে কফ্ ধাতুর শান্তি হয়। রক্তবর্ণা—প্রবৃত্তি, নীলবর্ণা—স্থিতি ও শ্বেতবর্ণা—নিবৃত্তি। সাধারণ ব্রাহ্মণমাত্রেরই ব্রহ্মের এই তিন শক্তির উপাসনা বিধেয়। ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞান—ত্রি-সন্ধ্যায় গায়ত্রীর তিন রূপ সাধনের পর চতুর্থ তুরীয় বা নিশাসন্ধ্যার অধিকার জন্মায়। এই নিশাসন্ধ্যার সময় ত্রি-শক্তির সমন্বয়ে পূর্ণ-গায়ত্রীশক্তি সাধনাই কাম্য। তুরীয় বা নিশাসন্ধ্যায় অধিকার পেলে সাধক ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মকে নিগু‘ণভাবে দর্শন করেন। জীবের জীবনমুক্তি হয়।

তান্ত্রিকসাধনা বলতে বাহ্য পঞ্চতত্ত্বানুষ্ঠান বা কালীপূজা নয়। বাহ্য অনুষ্ঠান অভিষেক নয়, আদ্যতন্ত্রের চক্রানুষ্ঠান ও পূজা অর্চনা মদ্যপান করলেই বীরাচারী হয় না। পঞ্চ ম-কার যোগে কালীপূজাই তান্ত্রিক সাধনার সব নয়। আগে কালী তারপর তারা, তদনন্তর ত্রিপুরাসুন্দরীর সাধনা ব্যতীত ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয় না। শাক্ত্যাভিষেক সাধনমার্গের প্রবেশদ্বার মাত্র। শাক্ত্যাভিষিক্ত হয়ে সাধক ক্রমে পুরশ্চরণাদি করার পর পূর্ণাভিষেক সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম করার পর ব্রহ্মমন্ত্র গুরুপাদুকা মন্ত্রলাভ ও জপাদি কর্ম্ম আরম্ভ হয়। এই সময় আসন জপ ও নিয়মাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণের পর গুপ্তাবধূতের গূঢ় তন্ত্রাচার অনুষ্ঠান। অনন্তর ক্রমদীক্ষাভিষেক। এই সময় হঠ-যোগের সঙ্গে মন্ত্রযোগের সাধন ও বীরাচার সাধনায় সাধককে কঠিনতর

ব্রহ্মচর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। অতপর সাম্রাজ্যাভিষেক। এই অবস্থায় সাধককে মন্ত্রযোগ সাধনার উচ্চজ্ঞানীর সম্মান দেওয়া হয়। লয় যোগের আংশিক ক্রিয়া, যথাবিধি পুরশ্চরণাদি পরীক্ষা শেষে হলে পরবর্ত্তী মহাসাম্রাজ্যাভিষেক দেওয়া হয়। মন্ত্রযোগের উচ্চতর ক্রম, মন্ত্রযোগের মানসপূজায় পূর্ণত্ব লাভ, ধ্যান যোগ। এর পর যোগদীক্ষাভিষেক; ইহাই সাধনমার্গে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অবস্থা—এই সময় সর্ব্বদা অভিজ্ঞ গুরুর নিকট থেকে পঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণ ও হঠযোগ সাধন হলে পূর্ণদীক্ষাভিষেক পাবার অধিকারী হন সাধক। তৎপর অন্তিম অভিষেক—মহাপূর্ণদীক্ষা বা রাজযোগ, যাকে চলতি কথায় বলে, পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী। কথাটা হল—পৈতে পরে ব্রহ্মচারী, আর পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী অর্থাৎ শিখা সূত্র ত্যাগ। এই অবস্থায় সাধক পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সন্ন্যাসী বা মুক্ত অবধূত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

১৪। কুমার নরপৎ সিংএর পিতা অর্জ্জুন সিং ছিলেন সিংভূম বিদ্রোহের নায়ক। পশ্চিম সীমান্ত-বাংলার বিস্তীর্ণ অরণ্যরাজ্য জঙ্গল মহল, অগণিত ভূমি রাজ্য। ধলভূম, মল্লভূম, তুঙ্গভূম, সামন্তভূম, বরাহভূম, শিখরভূম, মানভূম প্রভৃতি সপ্তভূমির বাহিরেও জঙ্গল মহলের সীমারেখা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া

সিংভূম বিদ্রোহের ইতিহাস

কোম্পানীর পলিটিক্যাল এজেণ্ট বা অধিকর্ত্তা হয়ে এলেন মেজর রাফ্‌সেড্‌। তিনি জঙ্গলমহলের পরিধির বাহিরে 'হো ভূমি' সিংভূম রাজ্যের অরণ্যভূমির রহস্য জানা ও কোম্পানীর অধিকারহীন দেশের দিকে ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রহস্যের অনুসন্ধান করেন। তাই কয়েকজন অনুচরকে সীমান্ত রাজাদের কাছে পাঠান। তাঁরা রাফ্‌সেডকে সাবধান করে দিয়ে হো-ভূমি সিংভূম রাজ্যে ভুলক্রমেও পদার্পণ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাতে তার কৌতুহল বেড়ে যায়। তিনি জেনেছিলেন, উত্তরে নাগবংশীয়দের রাজ্য ছুটিয়া নাগপুর। দক্ষিণে নদী বৈতরণী। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে দুর্গম ও ভয়ঙ্কর অরণ্যময় সাত শ পাহাড়ের দেশ সারাণ্ডা। পূর্ব্বসীমায় ধলভূম রাজ্য। পূর্ব্ব-দক্ষিণে উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ। এরই মধ্যে স্বপ্নের মত সুন্দর অথচ দুঃস্বপ্নের মত বিকৃত ভয়াবহ দেশ—কোলহান সিংভূম রাজ্য। দুর্ভেদ্য, দুর্গম, দুর্দ্ধর্ষ এবং দুরন্ত। এই অঞ্চলের মধ্যে পোড়াহাট নামক স্থানে সিং রাজাদের রাজধানী। সিং রাজাদের নাম অনুসারেই সিংভূম নামকরণ হয়। হো-দের মতে সিং বোঙার রাজ্য বলেই তাদের দেশের নাম সিংভূম—সূর্য্য দেবতার রাজ্য। এদেশে অন্য কোন মানুষকে তারা অনায়াসে পদার্পণ করতে দেয় না। তাঁদের

পবিত্র সাজান স্বাধীন দেশে কেউ এসে অরণ্যের শান্তি বিঘ্নিত করে এ তাদের কাছে অসহনীয়। লড়কা কোল বা যুদ্ধবাজ কোল নামে অখ্যাতি আছে ওদের। হো-রা বলে, ওরা সিং রাজার প্রজা হয়েছে রঁাচী থেকে এসে। রাচী থেকে এসে মূল মুণ্ডা-গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা হো নামে পরিচিত হয়—ওদের নতুন দিশুম সিংভূমে। বনজঙ্গল কেটে সিংভূমেই খুঁটি পুতে ওরা নিজেদের দখল কায়েম করে।

আঠার শ' খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্য্যন্ত এই অরণ্যদুর্গের মানুষগুলি বারবার বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বাঘের মত দুরন্ত লাফে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আঠার শ' সাতান্ন সাল। সিংভূম পোড়াহাট রাজ্যের অধিপতি অর্জুন সিং। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের অনুগামী একজন রাঠোর রাজপুতের বংশধর তিনি। অর্জ্জুন সিং এই হো-দের কাছে দেবতার মত পূজনীয়। সিং বোঙার মতই তাঁর সম্মান। সিং রাজা আর সিং বোঙা ওদের কাছে প্রায় একই। অর্জ্জুন সিং ডাক দিলে বনপাহাড় ফুঁড়ে হাজার হাজার হো, হাজার হাজার অরণ্যপুরুষ নেংটি পরে তীর ধনুক, কুড়ুল টাঙ্গি হাতে চিতার মত ক্ষিপ্রবেগে বেরিয়ে আসবে। দেশপ্রীতির পরিচয় এরা বহুবার দিয়েছে। বৃটিশরা সহজে এদেশে পদার্পণ করতে পারে নি।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। কোম্পানীর ভাড়াটে ফৌজ সব জায়গায় বীর সিপাহীদের কাছে কচুকাটা হয়ে যাচ্ছে। সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সমগ্র দেশের গণশক্তি। ঝাঁসী-কানপুর-দিল্লী-মীরাট-পাটনা সর্ব্বত্রই স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে। সেই সময় ৩০শে জুলাই রঁাচী ও হাজারীবাগের সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। চাইবাসার সিপাহীরা হাজারীবাগের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে কি করবে স্থির করার পূর্ব্বেই ওদের মতিগতি আঁচ করতে না পেরে চাঁইবাসার তদানীন্তন ডেপুটি কমিশনার সাহেব আত্মরক্ষার জন্য আগে থেকেই পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে রাণীগঞ্জে পালিয়ে যান। তখন সিপাহীদের কাছে বৃটিশ শক্তির স্বরূপটি ধরা পড়ে, তারা ট্রেজারী লুঠ করে। টাকাকড়ি নিয়ে ওরা যখন রঁাচীর পথে রওনা হয় তখন হো-রা ওদের বাধা দেয়। অর্জ্জুন সিং ওদের আশ্রয় দেন, কিন্তু টাকাকড়ি সব নিজে নেন। অর্জ্জুন সিংএর তখন অবশ্য সাধারণ ধারনা ছিল যে সিপাহীরা টাকা লুঠ করে নিয়ে পালাচ্ছে কিন্তু তিনি ধারনা করতে পারেন নি যে ওরা স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অংশীদার। তাই তিনি নিজে রঁাচী গিয়ে রঁাচীর তদনীন্তন কমিশনার ডালটন সাহেবের সঙ্গে দেখা করে টাকাকড়ি ফিরিয়ে দেন। কিন্তু

তা'হলে কি হবে? সিপাহীদের আশ্রয় দিয়েছেন বলে ডালটন সাহেবের কাছে তিনি সন্দেহভাজন হলেন। সন্দেহ যখন আছে তখন আগে থেকেই সাবধান হতে চায় ওরা। তাই নির্ব্বিঘ্নে চাঁইবাসায় অর্জ্জুন সিংকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে ডালটন সাহেব মিষ্টি কথায় অর্জ্জুন সিংকে চাঁইবাসায় গিয়ে ডেপুটি কমিশনার বার্চ সাহেবের কাছে হাজিরা দিবার নির্দ্দেশ দেন।

অশান্ত দেশের অশান্ত নেতা বীর অর্জ্জুন সিং তার পোড়াহাট দুর্গে ক্ষোভে রাগে, ঘৃণায় ফেটে পড়ছিলেন। তার শক্তি সম্পর্কে তিনি অন্ধ ছিলেন না। বৃটিশের সুশিক্ষিত ফৌজের কাছে তাঁর অরণ্যবাহিনী আর হো-সর্দ্দাররা কতক্ষণ যুদ্ধ চালাবে? এ সংশয় তার ছিল। কিন্তু সংশয় দিয়ে দেশকে ভালবাসা যায় না। সংশয়ের অনেক ওপরে জন্মভূমির স্থান। আত্মবিশ্বাসে সুদৃঢ় ও অটল হয়ে উঠেছেন তিনি। তার স্মরণ আছে যে তিনি সিংভূমের রাজা—সিংভূমের সিংহরাজ। এই বিশ্বাসের আরেক অংশীদার—দেওয়ান জগন্নাথ। দেওয়ানের ওপর অগাধ আস্থা অর্জ্জুন সিং-এর। এমন সাহসী বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দেশপ্রেমিক দেওয়ান পেয়ে কেবল সিংভূমের রাজাই নয়, সারা দেশ ধন্য। দেওয়ান জগন্নাথ সিং বল্লেন, শয়তান ইংরাজদের বিশ্বাস করা চলবে না। সাতসমুদ্র তেরনদী পেরিয়ে বেনের জাত ব্যবসা করতে এসেছিল এদেশে। তারপর কেমন করে গোটা দেশের রাজা হয়ে বসল ওরা তা কে না জানে? মিষ্টিকথায় আহ্বান করেছে আপনাকে, কিন্তু মতলব ভাল নয়। সর্ব্বোপরি সেরাইকেলার রাজা যখন ওদের পরম বন্ধু। দেশে ত মীরজাফরের অভাব নেই। ঘরের মধ্যেই শত্রু। তা না হলে ইংরাজদের সঙ্গে মিতালী করে, ওদের বশংবদ অনুচর হয়ে দেশের সর্ব্বনাশ ঘটাতে চায়। অর্জ্জুন সিংকে আশ্বাস দেবার জন্য জগুদেওয়ান বল্লেন—রাজারা বিপক্ষে গেলেও সেরাইকেলার ও খরসোঁয়ার সাধারণ মানুষেরা কিন্তু আমাদের পক্ষে। জগুদেওয়ান গভীর অন্ধকারে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে হো-মানকীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এলেন। হো-জাতিরা মাথা নীচু করে রাজা অর্জ্জুন সিং-এর এ অপমান সহ্য করবে না। সাদা দিকুরা সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এই সোনার দেশ সিংভূমের বনপাহাড়, নদী নালা মাঠঘাটের কি মালিক হয়ে বসবে? মানকীদের জবাব—আমরা দেশরক্ষার জন্য তৈরী। আমাদের রাজা অর্জ্জুন সিং-এর গায়ে হাত দিলে একজন সাহেবকেও বেঁচে থাকতে দেব না এদেশে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। গোটা দেশ সিংভূম আর একবার কুড়ুল টাঙ্গি জাপটে ধরলো বজ্রকঠিন মুষ্টিতে। এদিকে হাজার

হাজার বিদ্রোহী এসে অর্জ্জুন সিংএর নেতৃত্ব স্বীকার করে অভিবাদন জানিয়ে গেল। সিংভূম থেকে ইংরাজদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য সমস্ত দেশ প্রস্তুত। এদিকে চাঁইবাসাতেও বসে লেফটেনান্ট বার্চ সাহেব উৎফুল্ল হয়ে দিন গুণতে শুরু করলেন। অর্জ্জুন সিংকে একবার বাগে পেলেই হয়। সেরাইকেলার রাজা কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন পোড়াহাটে। তারই প্ররোচনায় দহরু মানকী, শিবু মানকী, মার্কণ্ড দফাদার, জগন্নাথ সিং বাবু এবং আরও কয়েকজন গ্রামপ্রধান অর্জ্জুন সিং-এর বিরুদ্ধতা করার জন্য তৈরী হল।

সেরাইকেলার রাজাই তখন বার্চ সাহেবের প্রধান উপদেষ্টা—অরণ্যভূমিতে বিশ্বস্ত বৃটিশ-বন্ধু। অর্জ্জুন সিংএর খ্যাতি এবং হো-দের উপর তাঁর অখণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তিকে ঈর্ষা করতেন সেরাইকেলার রাজা। এই ঈর্ষার আগুন দিয়ে অর্জ্জুন সিংকে পুড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি। পোড়াহাট রাজ্য সেরাই-কেলার কুক্ষিভুক্ত করার স্বপ্নও ছিল তাঁর এবং এ বিষয়ে বার্চ সাহেবও তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। গুপ্তচররা এসে সংবাদ দিল অর্জ্জুন সিং ধরা দেবেন না, জগুদেওয়ান গ্রামে গ্রামে আবেদন জানাচ্ছে রাজার পক্ষে লড়াই করার জন্য। হো-রাও তৈরী। সংবাদ পেয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট বার্চ বুনো নেকড়ের মত রাগে ফুঁসতে লাগলেন, মুহুর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করে তিনি শিখ সৈন্যদের মার্চ করার আদেশ দিলেন, নিজে থাকলেন বাহিনীর পুরোভাগে।

অর্জ্জুন সিংও বসেছিলেন না, জগুদেওয়ানের গুপ্তচর আগেই খবর দিয়েছিল বার্চ সাহেব সদলবলে পোড়াহাটের দিকে আসছে। পোড়াহাটের অনতিদূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদীর ধারে অর্জ্জুন সিং-এর অনুগত সিপাহীরা তৈরী হয়ে থাকল। এদিকে সেরাইকেলার রাজা তার বিশ্বস্ত কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে কয়েজন সৈন্যকে পাঠিয়ে দিলেন এক গ্রামে। জগুদেওয়ান অন্য এক গাঁয়ে যাবার জন্য বনপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন একাই, সেরাইকেলার রাজার অনুচরেরা তাঁকে অতর্কিত আক্রমণে বন্দী করে রাতের অন্ধকারে চাঁইবাসার জেলখানায় নিয়ে এল। অতি দ্রুততার সঙ্গে দেওয়ানের বিচারপর্ব্ব শেষ হল চাঁইবাসাতে। বিদ্রোহের অভিযোগে তাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

বার্চের সৈন্যবাহিনী চতুরতার সঙ্গে অন্যপথে নদী পার হয়ে অর্জ্জুন সিংএর অজ্ঞাতসারে সোজা পোড়াহাটের দিকে এগিয়ে গেল। অর্জ্জুন সিং আত্মরক্ষার জন্য অরণ্যের গভীরতম প্রদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। জগুদেওয়ানের ফাঁসী এবং অর্জ্জুন সিংএর আত্মগোপনের কথা শুনে, সিপাহীরা

নেতৃত্বহীন অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রায় বিছিন্ন অবস্থায় অরণ্যে আত্মগোপন করল সবাই। বার্চ সাহেব সেরাইকেলার রাজাকে পোড়াহাট দুর্গের অধিপতি মনোনীত করে চাঁইবাসায় ফিরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মাস তিনেক অরণ্যরাজ্য স্তব্ধ হয়ে থাকল। শত চেষ্টা করেও অর্জ্জুন সিং এর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এর মধ্যে ফসল তোলার কাজও শেষ হয়ে গেল। হৈমন্তিক অগ্রাণে হো-রা ঘরে ঘরে ধান চালের সংস্থান করে ফেলল। বনে পাহাড়ে শীত পড়তে শুরু হয়েছে চারিদিকে। শীতের সেই গভীর রাতে বন পাহাড়ের ভেতর থেকে গুম্‌গুম্ করে নাগড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। শব্দ হচ্ছিল বড়পীর গ্রামে। সবাই শুনল, সবাই বুঝল— অর্জ্জুন সিংএর ডাক এসেছে। সবাই তৈরী হয়েছিল। এতদিনের স্তব্ধতা তাদের প্রস্তুতিকে সংগুপ্ত রেখেছিল মাত্র। সারা সিংভূমের অরণ্যপুরুষরা সোজাসুজি বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে, তীর ধনুক বর্শা কুড়ুল ধরে। এদেরই একদল দুঃসাহসী বীর পোড়াহাট দুর্গে ঢুকে পড়ল রাতের অন্ধকারে। উন্মাদের মত আঘাত করে চলল সামনের সব কিছুকে। সৈন্যরাও আক্রান্ত হয়ে গুলি চালাল এলোপাথাড়ী। কয়েকজন হো মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সেখানেই। কিন্তু রক্তে তাদের স্বাধীনতার নেশা! বাকী সৈন্য ও সেরাই-কেলার রাজা ইত্যবসরে পালিয়ে বেঁচে গেল। অর্জ্জুন সিং কিন্তু নিরুদ্দেশ। কোন সন্ধান নেই তাঁর।

এমনি করে আঠার শ' আটান্ন খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস এসে গেল। লেফ্‌টেন্যান্ট বার্চ এক পাও নড়তে সাহস করেন নি। একটা অজ্ঞাত ভয়ে তিনি সদা সন্ত্রস্ত! আরও সৈন্য চাই তাঁর। রাণীগঞ্জে সংবাদ দিলেন। সংবাদ পেয়ে একদল সৈন্য নিয়ে কর্নেল ফস্টার এলেন চাঁইবাসাতে। ঠিক হল বড়পীর গ্রাম আক্রমণ করা হবে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী লেফ্‌টেন্যাট বার্চ সৈন্যবাহিনী নিয়ে বড়পীর-এর দিকে অগ্রসর হলেন। সৈন্যবাহিনীর সামনে ঘোড়ায় চড়ে বার্চ, হেল আর ল্যাসিংটন দুপাশের পাহাড় বনের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সাঁই করে একটা তীর এসে লাগলো বার্চের বাহুতে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন তিনি। অবস্থা দেখে ল্যাসিংটন চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন—হল্‌ট্; এনিমি ইজ দেয়ার। সমস্তবাহিনী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ইংরাজের সুশিক্ষিত সেনাদল যুদ্ধ করার জন্য তৈরী কিন্তু প্রতিপক্ষ থেকে অবিশ্রাম বারিপাতের ন্যায় তীর-বৃষ্টি তাদের বিপর্য্যস্ত করে তুলল। বার্চ

আহত—ল্যাসিংটন দিশেহারা, সৈন্যরা তীরাহত মুমূর্ষু! শেষ পর্য্যন্ত ক্যাপ্টেন ল্যাসিংটনের হাতেও এসে লাগলো একটা তীর। তাতেই ঘোড়া থেকে ছিট্‌কে পড়লেন তিনি। আর একটা তীর বার্চ সাহেবের দক্ষিণ উরুতে শক্ত হয়ে বসে গেল। সেই অবস্থাতেই ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন তিনিও। মনোবল হারিয়ে ফেলল বার্চের সৈন্যদল। শিখ পদাতিক বাহিনী কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়তে লাগল, বন্দুকে গুলি ভরবার সময়টুকুও পেল না তারা। বেশ কয়েকজন হো-ও আহত হ'ল গুলিতে। ল্যাসিংটন্ আদেশ দিলেন—রিট্রিট্—ফিরে চল চাঁইবাসায়।

এই পরাজয়ের গ্লানি ও কলঙ্ক মোচনের ভার পড়ল কর্ণেল ফস্টারের ওপর। তিনি বুনো বর্ব্বরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য একটা বিরাট সৈন্যদল সহ চক্রধরপুরের পথে যাত্রা করলেন। চক্রধরপুরের পথে ফস্টার বাহিনীকে কোন বাধা দেয় নি হো-রা। সাহস বেড়ে গেল ফস্টারের। চক্রধরপুরে পৌঁছেই হুকুম দিলেন আগুন ধরিয়ে দাও, পুড়িয়ে মার জানোয়ারদের! গ্রামের নিরস্ত্র নির্ব্বিরোধী লোকেরা দলে দলে পালাতে লাগল। পলায়নরত ঐ লোকেদের ওপর এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়তে আদেশ দিয়ে পৈশাচিক আনন্দে মনের ঝাল মেটাতে চাইলেন কর্ণেল ফস্টার। সৈন্যদল গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাতে জ্বালাতে পোড়াহাটের দিকে এগিয়ে চলল।

দক্ষিণ দিকে বেঁকে গেছে পথটা। দুদিকে পাহাড় উঠেছে প্রাচীরের মত। নাম সিরিং সেনার ঘাট। এই ঘাটের দুদিকের পাহাড় জুড়ে অরণ্যপুরুষের দল বাঘের মত ওৎ পেতে বসেছিল। ফস্টারের সৈন্য বাহিনীর মার্চ করার শব্দ ওরা শুনতে পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল! এই গিরিপথে ফস্টার বাহিনী প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। কয়েকজন সৈন্য সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল; বন্দুকের গুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে হো-রা অনেকেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অরণ্যের আড়ালে মরে পড়ে রইল। অনেকের মৃতদেহ সিরিং-সেনা ঘাটে পড়ে থাকল। বিজয়ী ফস্টার পোড়াঘাটে পৌঁছে পরিত্যক্ত জনশূন্য দুর্গ অনায়াসে দখল করে নিল। এরপর অরণ্যপুরুষের দল সেই পুরাতন রীতিতেই পাহাড় বনে আত্মগোপন করে দিনের পর দিন গেরিলা যুদ্ধ চালাতে লাগল। কর্ণেল ফস্টারও শেষ পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন! ভাবলেন এমনভাবে যুদ্ধ চালান আর অধিক কাল সম্ভব নয়। সেরাইকেলার রাজার সঙ্গে পরামর্শ করে এক গুপ্তচরকে পাঠান হ'ল অর্জ্জুন সিংএর সংবাদ সংগ্রহের জন্য। গুপ্তচর মারফত অর্জ্জুন সিংএর খবর পেয়ে চাঁইবাসায় গোপন বৈঠক

বসল—বার্চ, ল্যাসিংটন, ফষ্টার, হায়েস প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হলেন সেরাইকেলার রাজা। অর্জ্জুন সিংও সংবাদ পেলেন চারদিক থেকে সৈন্যদল এগিয়ে আসছে। অর্জ্জুন সিং চিন্তিত হলেন। তিনি জানেন সরাসরি এই বিরাট শিক্ষিত সৈন্যদলের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্ন অরণ্যপুরুষেরা কুশলী সেনার মত যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না। বনাশ্রয় থেকে সপরিবারে বনপথে গ্রামান্তরে যাত্রা করলেন অর্জ্জুন সিং নিরস্ত্র অবস্থায়। ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস, অকস্মাৎ একদল সৈন্যের হাতে বন্দী হলেন অর্জ্জুন সিং —১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৯ সালে। হো-মানকীদের ফাঁসী দেওয়া হল চাঁইবাসার প্রকাশ্য রাজপথে দিনের আলোয়। এবার অর্জ্জুন সিংএর পালা। সিংভূমের সিংহকেও এমনি নৃশংসভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। দেশকে ভালবাসার অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে হবে ওর।

ইংরেজদের আবার গোপন বৈঠক বসল সেরাইকেলার রাজাকে নিয়ে। ইংরেজরা বুঝতে পারল, অর্জ্জুন সিংকে ফাঁসি দিলে হয়ত পুনঃ সিপাহী বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হবে। তার চেয়ে অন্যভাবে, এমন কি তাঁরা কত দয়ালু এ কথা বুঝিয়ে দিয়ে সেরাইকেলার রাজার পরামর্শে অর্জ্জুন সিংকে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয় বিবেচিত হল। অর্জ্জুন সিংকে বারাণসীধামে স্থানান্তরিত করা হল। সেখানেই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি একমাত্র পুত্র কুমার নরপৎ সিংকে রেখে পরলোক গমন করেন।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা

(১)

পরলোক ও জন্মমৃত্যু প্রবাহের স্বরূপ

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়, তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে আরুণেয় শ্বেতকেতু এবং পঞ্চালরাজ প্রবাহনের পঞ্চপ্রশ্নাত্মক আখ্যায়িকায় পঞ্চাগ্নি বিদ্যার বর্ণনা আছে। রাজা প্রবাহনের সভায় উপস্থিত হলে, তিনি শ্বেতকেতুকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন[১]

(ক) প্রাণিগণ কি (মৃত্যুর পর) এতদপেক্ষা ঊর্দ্ধে গমন করে ?

(খ) প্রাণিগণ কী প্রকারে ইহলোকে ফিরে আসে ?

(গ) দেবযান ও পিতৃযান, এই পথদ্বয়ের ব্যবর্ত্তনা (পরস্পর বিয়োগস্থান) কী ?

[দেবযান ও পিতৃযান, এই পথদ্বয় স্বতন্ত্র হলেও পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। উভয় পথই একসঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে। এই কারণে এই দুই পথে যারা গমন করে, তাহাদিগকে 'সহগামী' বলা যেতে পারে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এজন্য তাঁর ভাষ্যে "সহগচ্ছতাম্" বলেছেন।]

[১] শ্বেতকেতু পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে আপন পিতা গৌতমের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করলেন। গৌতম উত্তর দিলেন : আমিও জানি না। এই কথা বলে গৌতম স্বয়ং রাজা প্রবাহনের নিকট গমন করে বললেন : তুমি আমার পুত্রের সমীপে যে পঞ্চপ্রশ্নাত্মক কথা বলেছ, সেই কথাই আমাকে বল। অনেক বাদানুবাদের পর রাজা প্রবাহন গৌতমকে গুহ্য বিদ্যার উপদেশ করলেন এবং বললেন—তোমার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ এই বিদ্যা অবগত ছিলেন না, এই বিদ্যা এতকাল ক্ষত্রিয়-পরম্পরা ক্রমেই চলে এসেছে। তথাপি এই বিদ্যা তোমাকে বলিব। তোমাকে দান করার পর অপর ব্রাহ্মণগণেও ইহা যাবে। উপরোক্ত উপনিষদের পরবর্ত্তী চতুর্থ খণ্ডে, প্রবাহন প্রথমেই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন।

(ঘ) যাহাতে এই পিতৃসম্বন্ধী লোক (চন্দ্রলোক) প্রাপ্ত হয়ে জীবগণ পুনর্ব্বার ফিরে আসে, সেই চন্দ্রলোক পরলোকগামী বহুলোক দ্বারা কেন পূর্ণ হয় না?

(ঙ) পঞ্চমী (পঞ্চম সংখ্যক) আহুতি অর্পিত হলে, সেই আহুতি হতে নিষ্পন্ন এবং আহুতির সাধনস্বরূপ জল (সোমঘৃতাদি রসসমূহ) কী প্রণালীতে পুরুষ পদবাচ্য হয় অর্থাৎ প্রাণী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়?

বোধসৌকর্য্যার্থে রাজা প্রবাহন প্রথমেই পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন। ইহাই শ্রুতিতে[৩] পঞ্চাগ্নি বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্চম প্রশ্নটি হল এই—পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষ বচসো ভবন্তীতি? অর্থাৎ পঞ্চমী আহুতি জলের কি প্রকারে পুরুষ (প্রাণী) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়?

অসৌবাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চ্চি-শ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গা (৩৪৭।১)।

অস্যার্থ—হে গৌতম, এই প্রসিদ্ধ দ্যুলোকই অগ্নি, আদিত্যই তার সমিৎ (কাষ্ঠ); রশ্মিসমূহ ধূম, দিবসই অর্চ্চি বা শিখাস্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গাররাশি, নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গসমূহ। দীপ্তির হেতুভূত বলে আদিত্যদেব সমিৎস্থানীয়। দিবসের শিখা নির্ব্বাপিত হলেই অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে। এজন্য চন্দ্রকে অঙ্গার রাশিস্বরূপ বলে উপমা দেওয়া হয়েছে।

এক্ষণে এই দ্যুলোকস্বরূপ অগ্নিতে কী অহুতি দেওয়া হয় এতদর্থে শ্লোক আরব্ধ হয়েছে—তস্মিন্নেতাস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতে সোমো রাজা সম্ভবতি (৩৪৮।২)।

[২] শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে—সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার ফলে উত্তরায়ণ গতি লাভ হয় (মৃত্যুর পর) এবং যাহারা কেবলই কর্ম্মী—জ্ঞানরহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তাহাদের সম্বন্ধে পুনরাবৃত্তির লক্ষণ দক্ষিণায়ণ গতি এবং তদপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকের পক্ষে ক্লেশপ্রদ সংসার গতি।

মৃত্যুর পর অগ্নিহোত্রী (যিনি প্রাতে ও সায়ংকালে আহুতি প্রদান করেন) প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে আবার দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী—এই পাঁচটি পদার্থের মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রাণিদেহ লাভ করে থাকেন। উক্ত পাঁচটি পদার্থকে যদি অগ্নিরূপে কল্পনা করে উপাসনা করতে পারে, তা হলে উপাসক পিতৃলোকপ্রাপক দক্ষিণায়ণে গমন না করে উত্তরায়ণ পথে গমন করতে সক্ষম হন। ইহারই নাম 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' উপাসনা।

অস্যার্থ। সেই এই দ্যুলোক-অগ্নিতে দেবতাগণ অর্থাৎ যজমানের প্রাণসমূহ শ্রদ্ধাকে (সূক্ষ্ম অপ্ সমূহ শ্রদ্ধা অবলম্বনে সংস্কার বিশেষ সম্পন্ন হয়—এজন্য জলকে শ্রদ্ধা বলা হয়েছে) হোম করে থাকেন অর্থাৎ দ্যুলোকে প্রবিষ্ট হন এবং তাহা হতে দীপ্তিমান (রাজা) সোম সমুৎপন্ন হন (সোম রাজা হন)। তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞকর্ত্তা—যজমানগণ আহুতিময়—আহুতি ভাবনায় ভাবিত হয়ে এবং আহুতিরূপ কর্মদ্বারা আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধা শব্দবাচ্য অপ্ সমবেত হয়ে দ্যুলোকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ সোমস্বরূপ হয়ে থাকে।

এক্ষণে দ্বিতীয় হোম-ক্রম কথিত হতেছে। এতদ্বিষয়ক শ্লোকের (৩৪৯।১) অর্থ এই প্রকার—

প্রসিদ্ধ পর্জ্জন্যই (যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে বৃষ্টি হয় তদভিমানী দেবতা বিশেষ) অগ্নি—বায়ুই তাহার সমিৎস্বরূপ, অভ্র (জলভরা অবস্থা মেঘ) ধূমস্বরূপ, বিদ্যুৎ—শিখাস্বরূপ, অশনি—অঙ্গার স্বরূপ, মেঘগর্জ্জন বিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্ব্বর্ষং সম্ভবতি (৩৫০।২)।

অস্যার্থ। যজমানের প্রাণরূপী দেবতাগণ সেই এই পর্জ্জন্যাগ্নিতে দীপ্তিমান সোমের আহুতি প্রদান করেন, সেই আহুতি হতে বৃষ্টি সমুদ্ভূত হয়ে থাকে।

এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে শ্রদ্ধা সংজ্ঞক জল সমূহই সোমাকারে পরিণত হয় এবং পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়।

এক্ষণে তৃতীয় হোম কথিত হতেছে।

হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, সম্বৎসর সমিৎ, আকাশ ধূম, রাত্রি অর্চ্চি, দিক্‌সমূহ অঙ্গার, অবান্তর দিক্‌সমূহ স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। এই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষ (বৃষ্টি) আহুতি করেন। তা হতে অন্ন (ধান্যযবাদি) সমুৎপন্ন হয়।

এক্ষণে চতুর্থ হোম কথিত হতেছে।

হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি—বাক্যই তার সমিৎ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা অর্চ্চি, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন আহুতি প্রদান করেন। এই আহুতি হতে রেতঃ সমুৎপন্ন হয়।

এক্ষণে পঞ্চম হোম কথিত হতেছে।

হে গৌতম স্ত্রীই অগ্নি, উপস্থ সমিৎ আর যে সম্ভাষণ করে তাহাই ধূম, জননেন্দ্রিয়ই অর্চ্চি, আর যে আভ্যন্তরীণ করা তাহাই অঙ্গারস্বরূপ এবং আনন্দানুভূতি স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। এই আনন্দকে মূল শ্লোকে অভিনন্দা বলা হয়েছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করেছেন—স্বল্পমাত্রসুখ—স্ফুলিঙ্গবৎ। এই অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আহুতি প্রদান করেন। তাহা হতে গর্ভ উৎপন্ন হয়।

অতএব, হোমসংশ্লিষ্ট সেই জলই এইরূপে শ্রদ্ধা, সোম, অন্ন ও রেতঃ রূপে আহুতিক্রমে গর্ভীভূত হয়। তন্মধ্যে আহুতির সহিত সম্বন্ধ বলে জলেরই প্রাধান্য বিবক্ষিত হয়েছে। সেজন্য পঞ্চম্যামহুতাবাপ ভবন্তীতি অর্থাৎ পঞ্চমী আহুতিতে অর্পিত জলসমূহ পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে। বাস্তবিক-পক্ষে ঐ জল (ত্রিবৃৎকৃত—পৃথিবী, জল ও অগ্নির সমষ্টি) অথবা পঞ্চীকৃত—পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি) এবং এই সকলের মধ্যে জলভাগের আধিক্য নিবন্ধন আপ্ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই জলই (দ্রবময়) রেতঃরূপে গর্ভাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এরূপে পঞ্চম আহুতি আহুত হলে, পরে জলভাগ পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে। দ্যুলোক থেকে পৃথিবী অভিমুখে আগত আহুতিগুলি পর্য্যায়ক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীতে প্রবেশপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ জন্মের নিমিত্ত উত্থিত হয় এবং গর্ভে যথাসম্ভবকাল জরায়ুবেষ্টিত অবস্থায় অবস্থান করে পরে ভূমিষ্ঠ হয়। ইহাই রাজা প্রবাহনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর (আংশিক)।

৫৮৷২৩ শ্লোক: সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয়ে আয়ুর নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত (পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে যে পরিমাণ আয়ু প্রাপ্ত হয়েছে) জীবন ধারণ করে। স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী লোক উদ্দেশ্যে প্রেত (প্রস্থিত—মৃত) হয়। সেই লোককে ঋত্বিকগণ (বা পুত্রগণ) অগ্নিসংস্কারার্থ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নিয়ে যায়। (অভিপ্রায় এই যে) যে অগ্নি হতে শ্রদ্ধাদি আহুতি পরম্পরায় আগত হয়েছে এবং যে পঞ্চাগ্নি হতে সম্ভূত—সমুৎপন্ন হয়েছে, সেই অগ্নির উদ্দেশ্যেই নিয়ে যায়। অর্থাৎ তাহাকে স্বীয় উপাদানভূত অগ্নিকেই প্রাপ্ত করায়।

৩৫৷১ শ্লোকে রাজা প্রবাহনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হতেছে। প্রশ্নটি পুনরুল্লেখ করা হল। তুমি জান কি, প্রাণিগণ এখান থেকে উর্দ্ধে যেখানে গমন করে?

(ক) যাঁহারা (গৃহস্থগণ) এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা অবগত হন এবং (খ) যাঁহারা (বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীগণ) অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করেন তাঁহারা অর্চ্চিতে[৪] গমন করেন, অর্চ্চি হতে অহঃ, অহঃ হতে শুক্লপক্ষ এবং শুক্লপক্ষ হতে উত্তরায়ণ পথ (দেবযান) প্রাপ্ত হন।

৩৬০।২ শ্লোক: উক্ত ছয় মাসের পর (সূর্য্য যে ছয় মাস উত্তরদিকে গমন করেন তারপর) সংবৎসর, সংবৎসরের পর আদিত্য, আদিত্যের পর চন্দ্র, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন। অমানব পুরুষ এসে সেখান থেকে তাহাকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান।

৩৬১।৩ শ্লোক: পক্ষান্তরে যে সমস্ত গৃহস্থ গ্রামে ইষ্ট (যজ্ঞাদি), পূর্ত্ত (কূপ তাড়গাদি দান) ও দত্ত (যথাশক্তি) দান,[৫] এই সমস্ত কর্ম্মের উপসনা করেন অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদনে তৎপর থাকেন, অথবা যাহারা অশুদ্ধচিত্ত—শত্রুসংযোগে যাহাদের দ্বেষ, আর মিত্রসংযোগে অনুরাগ এবং হিংসা ও অনুগ্রহ নিবন্ধন ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি; অধিকন্তু হিংসা, অসত্য, কপটতা ও ব্রহ্মচর্য্যাভাব প্রভৃতি বহুতর অশুদ্ধিকারণ তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। তাহারা মৃত্যুর পর প্রথমে ধূম্রাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, ধূম্রের পর রাত্রি, রাত্রির পর কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষের পর সূর্য্যদেব যে ছয়মাস দক্ষিণ দিকে গমন করেন সেই ছয়মাসকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহারা সম্বৎসরকে

[৪] এই অর্চ্চিরাদি মার্গে গমনকালে মূর্দ্ধণ্য নাড়ী দ্বারা প্রাণের উৎক্রমণ হয়। শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে—তাঁহার (ব্রহ্মবিদের) প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়গণ) আর বহির্গত হয় না। এখানেই নিজ নিজ উপাদানে বিলীন হয়ে যায়। অপর শ্রুতি, তাহা (মূর্দ্ধণ্য) নাড়ী দ্বারা নির্গত হয়ে অমৃতত্ব লাভ করে। পুনঃ শ্রুত্যন্তরে—সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে (উৎক্রমনেচ্ছু পুরুষের)।

[৫] ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত সংজ্ঞার অর্থ। অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদোক্ত ক্রিয়া রক্ষা, অতিথি সেবা, বৈশ্বদেব বলি—এ সমস্ত কর্ম্মকে ইষ্ট বলা হয়। বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, অন্নদান, উদ্যান নির্ম্মাণ প্রভৃতি 'পূর্ত্ত'। শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা, সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসা, দান করা প্রভৃতির নাম দত্ত।

প্রাপ্ত হন না। এখানে জ্ঞানদৃষ্টি-রহিত বলে ধূম্র সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েছে—ইহাই পিতৃযান পথ।

৩৬২।৪ শ্লোক: দক্ষিণায়ণ ছয় মাসের পর পিতৃলোকে, পিতৃলোক হতে আকাশে, আকাশ থেকে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন। ইহাই দীপ্তিমান সোম। তাহাই দেবগণের অন্নস্বরূপ, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন অর্থাৎ উপভোগ করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবগণ) চন্দ্ররূপী অন্নকে ভক্ষণ করেন (এই ভক্ষণ করার অর্থ মুখে চিবিয়ে খাওয়া নহে—এখানে ভক্ষণের অর্থ ভোগোপকরণভূত হওয়া)। অভিপ্রায় এই যে, ইষ্টাদি কর্ম্মীগণ দেবগণের উপভোগ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা দেবগণের সহিত সুখে ক্রীড়া (আমোদ প্রমোদ) করেন মাত্র এবং তাঁদের সুখভোগোপযুক্ত জলময় শরীর চন্দ্রমণ্ডলে আরব্ধ হয়ে থাকে। শরীর রূপ অন্তিম আহুতিরূপ অগ্নিতে আহুত হলে পর অগ্নিদ্বারা শরীর দগ্ধ হবার সময় শরীরোত্থিত জলসমূহ তৃণ ও মৃত্তিকাদির ন্যায় সেই যজমানকে বেষ্টন করে ধূমের সহিত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করতঃ স্থূল শরীরের উৎপাদন করে থাকে। সেই জলারব্ধ শরীর দ্বারা তাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মফল উপভোগ করত চন্দ্রলোক সম্ভোগের নিমিত্তভূত কর্ম্মের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন (এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্যাবলম্বনে করা হয়েছে)।

৩৬৩।৪ শ্লোক: চন্দ্রমণ্ডল হতে কর্ম্মীগণ স্বকৃত কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করার পর সেখান থেকে অবরোহণ করেন। সেই অবরোহণ ক্রম অত্র শ্লোকে কথিত হতেছে। (অবরোহণ=পতন)।

কর্ম্মীপুরুষগণ যে ক্রমানুসারে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন সেই পথকে লক্ষ্য করে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হন। প্রথমে অন্তরীক্ষলোক প্রাপ্ত হন, অন্তরীক্ষ হতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ুভূত অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত হয়ে ধূমাকার হন। ধূমাকার হয়ে অভ্র হন অর্থাৎ সজল মেঘাকার প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মীপুরুষ যে কর্ম্মের ফলে চন্দ্রমণ্ডল আরোহণ করেন, সেই সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হলে তাঁহারা অধোলোকে পুনঃপতিত হন। যাবৎ সম্পাত (কর্ম্মক্ষয়) না হয় তাবৎকালই চন্দ্রমণ্ডলে বাস সম্ভব হয়। 'পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হও' বাক্য দ্বারা সূচিত হতেছে যে, পূর্ব্বেও ঐ কর্ম্মীগণ অনেকবার চন্দ্রমণ্ডলে গিয়েছেন এবং সেস্থান হতে ফিরে এসেছেন।

এখানে কর্ম্মক্ষয় অর্থে—মুক্তি বুঝায় না, কারণ ভুক্তাবশেষ কর্ম্মানুসারেই পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ হয়।[৬]

৩৬৩।৫ শ্লোকের বিশদার্থ বলা হতেছে। চন্দ্রমণ্ডলে কর্ম্মীদিগের শরীরোৎপাদক যে-সমস্ত জল ছিল, তাহারাই ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বিলীনাবস্থায় আকাশে অবস্থান করতঃ সে সূক্ষ্ম-আকাশস্বরূপই হয়ে থাকে। তারাই আবার আকাশ হতে বায়ুভূত হয় এবং বায়ু দ্বারা ইতঃস্তত সঞ্চালিত হতে থাকে।

সেই জলসমূহের সহযোগে ক্ষীণকর্ম্মা (যাহার ভোগোপযোগী কর্ম্মক্ষয় হয়েছে সেই) পুরুষও বায়ুভূত হয়ে থাকে। বায়ুভূত হয়ে আবার সেই জলের সঙ্গেই ধূম হয়। ধূম হয়ে অভ্র (কেবল জলধারণযোগ্য) মেঘের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৩৬৪।৬ শ্লোক—

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি,
ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে,
অতো বৈ খলু দুর্নিস্প্রপতরম্, যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ
সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি।

শ্লোকের শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ। অভ্র হয়ে তৎপর তাহার জল সেচনক্ষম মেঘস্বরূপ হয়। অনন্তর, মেঘ হয়ে উচ্চপ্রদেশে (পর্ব্বতাদিতে) বর্ষিত হয়—অর্থাৎ কর্ম্মশেষসম্পন্ন জীব জলধারারূপে পতিত হয়। সেই ক্ষীণকর্ম্মা জীব —ধান্য, যব, তৃণলতা, বৃক্ষ, তিল, মাষকলাই ইত্যাদিরূপে এখানে জন্মধারন করে। কর্ম্মক্ষয়ে যারা ঐরূপে ফিরে আসে তারা সংখ্যায় অজস্র। যেহেতু বর্ষার বারিধারারূপে যাহারা পতিত হয়, পর্ব্বততট, দুর্গমপ্রদেশে নদী, সমুদ্র, অরণ্য ও মরুভূমি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হওয়ায়, তাদের সহস্র সহস্র প্রকার আকারভেদ হয়ে থাকে।

এজন্য তারা অতিকষ্টে এই অবস্থা হতে নিষ্ক্রমণ করে (দুর্নিস্প্রপতর) —যেহেতু তারা পর্ব্বততট হতে নির্গত হয়ে নদীসমূহ বা সমুদ্রপ্রাপ্ত হয়—মকরাদি জলজন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় কিম্বা মকরাদির সহিত

[৬] এ বিষয়ে শ্রুতিতে আছে, তং বিদ্যা-কর্ম্মাণি সমন্বারভতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞাচ অর্থাৎ কর্ম্ম উপাসনা ও পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানসংস্কার মৃতব্যক্তির অনুগমন করে। ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মফলে সংসার বা পুনর্জন্ম উৎপন্ন হতেছে।

সমুদ্রগর্ভে বিলীন থাকতে থাকতে পুনশ্চ জলধর কর্ত্তৃক জলরাশির সহিত আকৃষ্ট হয়ে মরুভূমিতে, শিলাতটে কিম্বা অগম্য প্রদেশে পতিত হয়ে অবস্থান করে; কখনও বা সর্প ও মৃগ প্রভৃতি প্রাণী কর্ত্তৃক পীত হয়ে তাহাদের সহিত অপর কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়—এবম্বিধ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে থাকে (আর জন্মলাভ করতে পারে না)। কখনও বা অভক্ষ স্থাবর মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে সেখানেই শুষ্ক হয়। আর ভক্ষণযোগ্য স্থাবর-মধ্যে জন্মলাভ করলেও তাদের পক্ষে রেতঃসেককারী দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া দুর্ঘটই বটে। কারণ স্থাবর পদার্থের সংখ্যা বহু; এই কারণেই অতিকষ্টে নিষ্ক্রমণ বলা হয়েছে। ব্রীহিযবাদি ভাব প্রাপ্তি হয়েও নির্গমণ হওয়া অতিশয় ক্লেশকর।

কখনও বা উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী বা বালক বা অতিবৃদ্ধ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হলেও তারা মধ্যস্থলেই বিশীর্ণ হতে থাকে। কখনও বা কাকতালীয় ন্যায়ে রেতঃসেকক্ষম প্রাণী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। রেতঃসেকক্ষম যে যে ব্যক্তি কর্ম্মশেষসম্পন্ন জীব-যুক্ত অন্ন ভক্ষণ করে এবং যে যে ব্যক্তি ঋতুকালে স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, ভক্ষিত জীব ঠিক তদাকারই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কারণ রেতঃসেককালে রেতঃ পদার্থটি রেতঃসেককারীর সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার সম্পন্ন হয়ে থাকে। এজন্য মনুষ্য হতে মনুষ্যই হয়, গো হতে গো-র অনুরূপই হয়।

কিন্তু অনুশরী[৭] ভিন্ন অপর যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ না করে ইহলোকেই ঘোরতর পাপকর্ম্মের ফলে ব্রীহিযবাদি ভাব প্রাপ্ত হয়ে পুনশ্চ মনুষ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হয় তাহাদের নির্গমন অনুশরীদিগের ন্যায় অতিশয় দুঃখাবহ নহে। কারণ যেহেতু তাহারা স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা ব্রীহিযবাদি দেহ লাভ করেছে সেহেতুই তাহাদের ভোগ-নিদান কর্ম্মক্ষয়ের পর ব্রীহিযবাদি দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়; তৎপর তাহারা জলৌকার ন্যায় কর্ম্মানুরূপ নূতন দেহে[৮] প্রবেশ করে। তখন তাহাদের জ্ঞান ও অনুভব শক্তি অক্ষুন্নই থাকে। এই সচেতন ভাব তাহাদের পক্ষে (পাপকর্ম্মী) অতীব ক্লেশদায়ক। এ

৭ অনুশরী শব্দের অর্থ। চন্দ্রমণ্ডলগত কর্ম্মী পুরুষদিগের ভোগাবশিষ্ট কর্ম্মের নাম অনুশর। পৃথিবীতে প্রত্যাগমনকালে সেই কর্ম্মশেষ বা অনুশর সহযোগে আগমন করার জন্য তাহাদিগকে অনুশর বলা হয়ে থাকে।

৮ সাধারণতঃ প্রাণীমাত্রেরই দেহ দুইটি—একটি স্থূল, অপরটি সূক্ষ্ম। স্থূলদেহ পাঞ্চভৌতিক, আর সূক্ষ্মদেহ—পঞ্চপ্রাণ মনঃ বুদ্ধি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়

এ বিষয়ে একটি শ্রুতি আছে। দেহান্তর সংক্রমণ সময়ে জীব বোধশক্তিযুক্ত থাকে এবং সজ্ঞানেই দেহান্তরে সংক্রমণ করে। তাৎপর্য্য এই যে, যদিও মৃত্যুকালে ক্রিয়া সাধন ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি (ব্যাপার) সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং জীব তদাবস্থায়ই অন্য দেহ আশ্রয় করে থাকে সত্য, তথাপি স্বপ্নাবস্থার ন্যায় তখনও দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তভূত স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা উদ্বোধিত সংস্কারময় জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানসমন্বিত হয়েই দেহান্তরে গমন করে। এরূপ অর্চ্চিরাদি পথে (উত্তরায়ণ বা দেবযান) বা ধূমাদি পথে (দক্ষিণায়ণ বা পিতৃযান) যে গমন, তাহাও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্পন্ন হয় ; কারণ ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মই তাহার ঐরূপ গমনের কারণ। সুতরাং সেই কর্ম্ম দ্বারাই তাহার চিরসুপ্ত জ্ঞানসংস্কার তখন জাগরিত হয়ে উঠে। কিন্তু অনুশরী (কর্ম্মাবশেষ সম্পন্ন জীব) যাহারা ব্রীহি প্রভৃতিরূপে আবির্ভূত হয়, তাহাদের পক্ষে ঐরূপ রেতঃসিক (পুরুষ) ও যোষিৎদেহের সহিত জ্ঞান সহকারে সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় না। কেননা, ব্রীহি প্রভৃতির ছেদন, খণ্ডন, পেষণাদি কালে কখনই অনুভবসম্পন্ন জীবগণের অবস্থান হতে পারে না।[১]

অনুশরীগণ যখন চন্দ্রমণ্ডল হতে অবতরণ করেন তখন তাঁহাদের সচেতন ভাব থাকে না, সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের

ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক। স্থূলদেহ প্রত্যেকবার জন্মে ও মরে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহটির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থির থাকে। এই সূক্ষ্মদেহ অলম্বন করেই জীব নানাবিধ লোকে গমনাগমন করে। কিন্তু জোঁক যেমন অপর একটি তৃণ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ধৃত তৃণটি পরিত্যাগ করে না, তেমনি জীবও অপর একটি স্থূলদেহ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান স্থূলদেহ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে থাকতে পারে না। সেজন্য মৃত্যুকালে জীব জোঁকের ন্যায় কর্ম্মানুযায়ী ভাবী দেহটিকে মানসিক চিন্তা দ্বারা আশ্রয় করে, তৎপর বর্ত্তমান দেহটিকে পরিত্যাগ করে থাকে।

১ যাঁহারা জ্ঞানসহযোগে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন। আর যাঁহারা শুধু যাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা ধূমাদিমার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন। চন্দ্রলোকে স্বকর্ম্মানুযায়ী সুখসম্ভোগ সমাপ্তির পর, পূর্ব্বকৃত অবশিষ্ট কর্ম্মফলসহ পুনরায় পৃথিবীমণ্ডলে স্বকর্ম্মানুসারে মনুষ্যাদি দেহ লাভ করেন। নিয়ম এই যে, প্রথমে ধূমের সহিত পরে অভ্রের সহিত, তৎপর মেঘের সহিত সম্মিলিত হন, তদনন্তর বারিধারারূপে

চন্দ্রমণ্ডলে ভোগার্হ কর্ম্ম শেষ হয়ে গেলেই, তাঁহাদের হৃদয়ে অতিশয় ক্লেশের সঞ্চার হয়। ক্লেশাধিক্যবশতঃ শরীরে এত উষ্মা উপস্থিত হয় যে তাহার ফলেই তাহাদের সেই জলময় দেহ গলে যায় এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তখন তাহাদের বোধশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন তাহারা অজ্ঞানাবস্থায়ই মূর্চ্ছিতের ন্যায়, আকাশাদি ক্রমে পৃথিবীতে অবতরণ করে দেহবীজভূত জলে পরিবেষ্টিত হয়ে কর্ম্মফলে যে-সমস্ত স্থাবরাদি দেহ উৎপন্ন রয়েছে, সেই সমস্ত দেহের সহিত সম্মিলিত হন, সেইরূপ ব্রীহিযবাদি দেহে প্রবেশ করে মাত্র। কিন্তু এই অবস্থায় অনুভূতি থাকে না—কারণ ঐ সমস্ত বস্তু তাহাদের ভোগদেহ নহে। এরূপ ব্রীহি প্রভৃতির ছেদন, খণ্ডন, পেষণ পাক, ভক্ষণ, রসরুধিরাদিরূপে পরিণতি এবং রেতঃসেক সময় পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিতের ন্যায়ই থাকে। কারণ তাহাদের দেহান্তর সমুৎপাদক কর্ম্মসমূহ তখনও কার্য্যোন্মুখ হয় নাই। বিশেষতঃ কোন অবস্থাতেই দেহবীজভূত জলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে অবস্থিতি করেন না। এজন্য জলৌকার ন্যায় সচেতনত্ব বিরুদ্ধ হতেছে না। আর মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় যে জ্ঞানভাব তাহাও মূর্চ্ছিতেরই অনুরূপ। ইহাও বিরুদ্ধ হতেছে না।

এই কারণে, দেহান্তর সংক্রমণ সময়ে জীব বোধশক্তিযুক্ত থাকে এবং সজ্ঞানেই দেহান্তরে সংক্রমণ করে, এই শ্রুতিবাক্য সকল অবস্থাতেই এবং সর্ব্বকালেই প্রযোজ্য।

যদিও মৃত্যুকালে ক্রিয়াসাধন ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি (ব্যাপার) সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং জীব তদাবস্থায়ই অন্যদেহ আশ্রয় করে থাকে সত্য, তথাপি স্বপ্নাবস্থার ন্যায় তখনও দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তভূত স্বীয় কর্ম্মদ্বারা উদ্বোধিত সংস্কারময় জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞান সমন্বিত হয়েই দেহান্তর গমন করে।

অর্চ্চিরাদি পথে গমন ও ধূমাদি পথে চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ, এসকল কার্য্যও স্বপ্নাবস্থার ন্যায় উদ্বুদ্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। কেননা, ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মই তাহাদের ঐ গমনের কারণ। সুতরাং সেই কর্ম্মদ্বারাই তাহাদের চিরমুক্ত জ্ঞান সংস্কার তখন জাগরিত হয়ে উঠে।

পৃথিবীতে পতিত হওয়ার পর ব্রীহিযবাদিরূপে পরিণত হয়ে অন্নরূপে পুরুষপ্রাণী কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন; অনন্তর শুক্ররূপে পরিণত হয়ে স্ত্রী-শরীরে নিক্ষিপ্ত হয়ে তদনুরূপ দেহ ধারণ করেন। উক্ত ব্রীহিযবাদি অনুশয়ীদের প্রকৃত ভোগদেহ নহে—আশ্রয় মাত্র।

৩৬৫।৭ শ্লোক ঃ এখানে অনুশয়ীদিগের জন্মপরিগ্রহ প্রকার উক্ত হতেছে। চন্দ্রমণ্ডল হতে প্রত্যাগত জীবগণের মধ্যে যে সকল লোক ইহলোকে উত্তম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই অবিলম্বে ব্রাহ্মণযোনিই হউক বা ক্ষত্রিয়যোনি বা বৈশ্যযোনি হউক—উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হবেন। যাহারা অপকৃষ্ট কর্ম্ম করেছেন তাহারা অপকৃষ্ট জন্ম কুক্কুরযোনি, শূকর-যোনি প্রভৃতি প্রাপ্ত হবেন।

৩৬৬।৮ শ্লোক। যাঁহারা জ্ঞানানুশীলন করেন না এবং কর্ম্মানুষ্ঠানও করেন না, তাঁহারা উক্ত উভয় পথের (অর্চ্চিরাদি পথ ও ধূমাদি পথ) কোন পথেই গমন করেন না—তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল সেই 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব' ক্ষুদ্রপ্রাণীরূপে (ডাঁশ মশক কীট পতঙ্গ) পুনঃ জন্মলাভ করে থাকে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ ও মরবার জন্যই যেন তাহাদের কালক্ষয় হয়। জায়স্ব—জন্ম-ধারণ করা, ম্রিয়স্ব—মরে যাওয়া, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ইহারা এরূপ জন্ম ও মরণ যাতনা ভোগ করে, ঈশ্বর কেবল সাক্ষীরূপে তাহা সম্পাদন করে থাকেন মাত্র।

ইহাই পূর্বোক্ত পথদ্বয় হতে তৃতীয় স্থান এবং সেই হেতুই এই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হতেছে না। তাৎপর্য্য এই যে, দক্ষিণায়ণে প্রস্থিত ব্যাক্তিরাও ফিরে আসে। আর জ্ঞান ও কর্ম্মে অনধিকৃত ব্যক্তিগণের (জায়স্ব—ম্রিয়স্ব) দক্ষিণায়ণেও গমন হয় না। সেই হেতু এই চন্দ্রলোক পরিপূর্ণ হয় না।

রাজা প্রবাহনের পঞ্চম প্রশ্নটি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা নিরূপণেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম প্রশ্নটিরও দক্ষিণায়ণ ও উত্তারয়ণ পথ দ্বারাই উত্তর প্রদত্ত হয়েছে।

দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ পথদ্বয়ের বিয়োগ স্থান সম্বন্ধে যে প্রশ্ন হয়েছিল তাহাও মৃতব্যক্তিবর্গের অগ্নিতে নিক্ষেপ (জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয়েরই) তুল্য, সেখান থেকে পৃথক হয়ে জ্ঞানীগণ অর্চ্চিরাদি পথে ও কর্ম্মীগণ ধূমাদি পথে গমন করেন। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ পথে, ষন্মাস পূর্ত্তির সময়ে এই উভয়গণই পরস্পর সম্মিলিত হন এবং পুনরায় বিযুক্ত হয়ে জ্ঞানীগণ সম্বৎসরের পর অর্চ্চিরাদির পথে, আর কর্ম্মীগণ ষন্মাসের পর দক্ষিণায়ণ পথে পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অনুশয়ীদিগের কর্ম্মক্ষয়ের পর চন্দ্রমণ্ডল হতে আকাশাদিক্রমে পুনরাবৃত্তিও কথিত হয়েছে। চন্দ্রলোকের অপূরণ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর 'তেনাসৌ লোকেন সম্পূর্য্যতে' বলা হয়েছে।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা

(২)

দেহবিমোচন এবং তৎপরবর্ত্তী অবস্থা

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় ব্রাহ্মণে পুরুষের দেহবিমোচন, তাহা কোন সময়ে এবং কি প্রকারে হয়ে থাকে উহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

১। ২৯১।১ শ্লোক: লোকান্তরে প্রস্থানোদ্যত এই পুরুষ সেই সময়ে (মৃত্যুকালে) বলহীন হয়ে সম্মোহ বা বিমূঢ়ভাবই যেন প্রাপ্ত হয় (এখানে দেহের দুর্ব্বলতাকেই আত্মার দুর্ব্বলতা বলে আরোপ করা হয়েছে। কারণ আত্মা অমূর্ত্ত, নিত্যচৈতন্য জ্যোতিঃস্বরূপ—তাহার সম্মোহ বা অসম্মোহ কিছুই সম্ভবপর হয় না)।

২। ১৯২।২ শ্লোক: তখন চক্ষু প্রভৃতি প্রাণবর্গ নির্লে‍ৰ্পভাবে আদান করতঃ অর্থাৎ উপসংহৃত করতঃ (স্বপ্ন সময়েও ইন্দ্রিয়সমূহ সমাহৃত হয়, কিন্তু নির্লেপভাবে হয় না) হৃদ্‌পদ্মাকাশে (লিঙ্গদেহে) আগমন করে (২৯১।১ শ্লোক) অর্থাৎ লিঙ্গদেহে সম্মিলিত হয়।

সে সময়ে এই হৃদয়ের অগ্রভাগ অর্থাৎ আত্মা যে পথে নির্গত হবে, সেই নাড়ী-দ্বার আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। সেই প্রদীপ্ত হৃদয়াগ্রপথে আত্মা (লিঙ্গদেহ) নির্গত হয়। ভবিষ্যৎ ফলানুসারে বহির্গমনের পথ অনেক প্রকার হয়ে থাকে। যথা, সূর্য্যলোকে যেতে হলে চক্ষু-পথে, ব্রহ্মলোকে গমন করতে হলে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে, অন্যত্র যেতে হলে অন্যান্য শরীরাবয়ব দ্বারা নিক্রান্ত হয়।

সেই বিজ্ঞান-আত্মা জীব উৎক্রমণ করবার সময় তাহাকে লক্ষ্য করে প্রাণ উৎক্রমণ করতে থাকে।

প্রাণ উৎক্রমণ করবার সময় তাহাকে লক্ষ্য করে অপর সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়বর্গ উৎক্রমণ করতে থাকে। উৎক্রমণকালেও আত্মা বিজ্ঞানসম্পন্নই (জ্ঞানবাসনা যুক্তই) থাকে এবং ঐ বিজ্ঞান সহকারেই পরলোকে প্রস্থান করে। তখন তাহার ঐহিক উপাসনা ও কর্ম্ম এবং প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কার

'পূর্ব্বপ্রজ্ঞা'ও অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূতবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মের ফলানুভব হতে মনোমধ্যে যে বাসনা বা সংস্কার সৃষ্ট হয়েছে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, বর্ত্তমান জন্মে সে সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করতে হয়, সেই ফলানুভব হতে আবার এক প্রকার বাসনা বা সংস্কারের সৃষ্ট হয়। সেই ফলানুভবজনিত বাসনাই 'পূর্ব্বপ্রজ্ঞা' সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করতে থাকে।

৩। এই তাৎকালিক বিজ্ঞানে জীবের স্বাধীনতা থাকে না। মৃত্যু সময়ে স্বীয় কর্ম্মরাশি যখন তাহাকে নিয়ে যায় তখন তাহার কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না।

গীতায় উক্ত হয়েছে—সদা তদ্ভাব ভাবিত অর্থাৎ সর্ব্বদা সেইভাবে ভাবিত হয়ে……মানুষ সারাজীবন যে বিষয়ে অনুরাগী থেকে নিরন্তর উহার ভাবনা করে, সেই তীব্র ভাবনার ফলে মন তদ্বিষয়ে তন্ময়তা লাভ করে। মৃত্যু সময়ে তাহার সেই চিন্তাই উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুকালীন সেই ভাবনাই মুমূর্ষুর গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশ করে দেয়। অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে যেরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়, পরলোকেও তাহার সেরূপই জন্ম ও অবস্থা লাভ হয়ে থাকে। বিদ্যা কর্ম ও পূর্ব্বপ্রজ্ঞা পরলোক পথের সম্বল।

মৃত্যুসময়ে জীবের কর্ম্মানুসারে অন্তঃকরণ মধ্যে বিভিন্নাকারে বৃত্তি অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। বাসনাময় সেই সমুদয় বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ থাকায় সমস্ত লোকই সে সময় বিজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং সেই বিজ্ঞানের সহিতই গন্তব্যস্থানে গমন করে। অর্থাৎ মৃত্যু সময়ে বিশেষ বিশেষ বাসনাময় জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়ে তাহার সম্মুখে যেরূপ গন্তব্যস্থান উদ্‌ভাসিত করে দেয়, মুমূর্ষু জীব সেই স্থানাভিমুখেই প্রস্থান করে (আতিবাহিক বা লিঙ্গদেহ অবলম্বনে)।

৪। ২৯৩৩ শ্লোক: আত্মার বর্ত্তমান দেহ ত্যাগের পর শরীরান্তর গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হতেছে। জোঁক যেমন পূর্ব্বগৃহীত তৃণের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত যেয়ে অপর একটি তৃণকে গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে সংহৃত করে অর্থাৎ আপনার পশ্চাৎভাগকে সম্মুখের অংশে সন্নিবেশিত করে, ঠিক সেইরূপই এই আত্মাও (মুমূর্ষু জীবও) বর্ত্তমান শরীরটি নিহত (ত্যাগ) এবং চেতনাশূন্য করে অপর একটি দেহ অবলম্বন করতঃ আপনাকে সেখানে নিয়ে যায়। তাৎপর্য্য এই যে, সংসারী জীব (এখানে আত্মা) পূর্ব্বগৃহীত এই শরীরকে নিহত করে অর্থাৎ স্বীয় আত্মার উপসংহার দ্বারা

দেহকে অচেতন করতঃ জোঁক যেমন তৃণান্তর গ্রহণ করে তদ্রূপ দীর্ঘীকৃত স্বীয় বাসনা দ্বারা অপর দেহ অবলম্বন করে আত্মার উপসংহার করে, অর্থাৎ সেই দেহে আত্মাভিমান স্থাপন করে অর্থাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দেহে থেকেই নিজের জ্ঞান কর্ম্মানুসারে পরজন্মে যেরূপ দেহে যেতে হবে তদনুরূপ প্রবুদ্ধ বাসনাকে দীর্ঘতর করে ভবিষ্যৎ দেহপ্রাপ্তির স্থানে গমন করে, অর্থাৎ তখন ভবিষ্যৎ দেহ-বিষয়ে তাহার পূর্ব্বসংস্কার এরূপভাবে প্রবুদ্ধ হয় যেন সেই দেহটি প্রাপ্ত বলেই মনে হয়, মানসিক চিন্তা দ্বারা আত্মাভিমান স্থাপন করে—কিন্তু ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেহপ্রাপ্তি নহে।

সেখানে ইন্দ্রিয়গণ প্রাক্তন কর্ম্মশক্তির প্রেরণায় সব্যাপার হয়ে পরস্পর সম্মিলিত হয়, ফলে একটি বাহ্য-শরীর (স্থূলশরীর) সমুৎপন্ন হয়। অতঃপর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে সমাহৃত দেখে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রিয়সংঘাতে পুনঃ অধিষ্ঠিত হয়, ইহাই দেহান্তর সমুৎপত্তির প্রণালী (১৯৩৩)। এক্ষণে শঙ্কা হতেছে, যখন দেহান্তর সমুৎপন্ন হয়ে থাকে তখন কি যে সমস্ত দেহোপাদান সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে সেই উপাদানগুলিই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অপর নূতন দেহ বিরচিত হয়? অথবা সম্পূর্ণ নূতন উপাদান সংগৃহীত হয়ে থাকে? তদুত্তরে, পরবর্ত্তী শ্লোকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে।

৫। ২৯৪৪ শ্লোক: পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে আকাশ পর্য্যন্ত যে পঞ্চভূত সর্ব্বদাই প্রাপ্ত রয়েছে সেই পঞ্চভূতকেই বারবার উপমর্দ্দিত করে, অন্য অন্য নবতর আকৃতিবিশেষ, অর্থাৎ দেহান্তর নির্ম্মাণ করে থাকে। পরলোকে গমনোদ্যত এই আত্মাও বর্ত্তমান দেহটিকে নিহত (ত্যাগ) ও অচেতন করতঃ পিতৃলোক গমনোপযোগী কিম্বা গন্ধর্ব্বলোক দেবলোক অথবা ব্রহ্মলোক গমনোপযোগী এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানানুসারে অপরাপর ভূতগণের উপভোগযোগ্য শরীর নির্ম্মাণ করে থাকে।

৬। ২৯৫৫ শ্লোক: এই সংসারী আত্মা যে সমস্ত উপাধিযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সে সমুদয়ের নির্দ্দেশ করা হতেছে।

সেই আত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই বটে, কিন্তু উপাধিযোগে বিজ্ঞানময় (বুদ্ধির সহিত অভিন্নরূপ) ও মনোময় (মনের সহিত অভিন্নরূপ) হয়। এই প্রকার প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, (পার্থিব শরীরে) পৃথিবীময়, (জলীয় শরীরে) আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময় (প্রেতাদি শরীর),

কামময়, অকামময়, ক্রোধময় (ব্যহত কাম = ক্রোধ), অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময় এবং যেহেতু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুময়, সেজন্য পরোক্ষ বস্তুময়ও বটে অর্থাৎ যেরূপ কর্ম্ম ও আচারের অনুশীলন করে সেরূপ হয়। উত্তম কর্ম্মকারী উত্তম হয় আর অধম কর্ম্মকারী অধম হয়, পুণ্য কর্ম্মদ্বারা পুণ্যবান (সুখী) হয় আর পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপী (দুঃখী) হয়।

লোকেও বলে থাকে যে, এই সংসারী জীব কামময়; সে যেরূপ কামনাবাসনাশালী হয় সেরূপই সংকল্প করে, আবার যেরূপ সংকল্পসম্পন্ন হয় সেরূপই কর্ম্মানুষ্ঠান করে, ঠিক তদনুরূপ অবস্থাই লাভ করে।

৭। ২৯৬।৬ শ্লোক : জীবের পরলোকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলা হতেছে। মৃতুকালে জীবের লিঙ্গ—সূক্ষ্ম অথবা সূক্ষ্ম শরীরের অংশ মন যে বিষয়ে নিযুক্ত বা আসক্ত থাকে, সেই কর্ম্মের সংস্কার সহযোগে অর্থাৎ যে বিষয়ে তাহার প্রবল অভিলাষ থাকে এই সংসারী জীব সেই বিষয়ে অভিলাষী হয়ে তদনুকুল কর্ম্ম করে ও তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় এবং লোকান্তরে ফলভোগ শেষ করে ইহলোকে পুনর্ব্বার কর্ম্ম করবার নিমিত্ত, সেই লোক হতে ফিরে আসে। কারণ, এই মর্ত্তলোক স্বভাবতঃই কর্ম্মপ্রধান। পুনর্ব্বার কর্ম্ম করবার জন্য কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মফলে আসক্তি থাকার জন্য পুনর্ব্বার ইহলোকে ফিরে আসে। এই প্রকারে কামনাবান (সকাম) পুরুষ জন্মমরণ প্রবাহ ভোগ করতে থাকে।

৮। কিন্তু অকাময়মান (কামনাহীন) পুরুষ মৃত্যুর পর কোথায়ও গমন করে না। কারণ, যে ব্যক্তি ফলাসক্ত তাহার পক্ষেই পারলৌকিক গতি কথিত হয়েছে। সুতরাং কামনা-বিহীন পুরুষদের লোকান্তর গতি সম্ভব হয় না। অকাম অর্থাৎ যাঁহার নিকট হতে সমস্ত কামনা দূরীভূত হয়েছে তাঁহাকে আপ্তকাম বলা হয়, অর্থাৎ যিনি সমস্ত কাম প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিই আপ্তকাম। তাঁহার অপর কোনও বস্তু কাম্য বা প্রার্থনীয় নাই। আত্মাই তাঁহার নিকট একমাত্র কাম্য; বাহ্যাভ্যন্তর ভাববিহীন, পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞান, একরস আত্মাই যাঁহার সমস্ত, যাঁহার ঊর্দ্ধ অধঃ বা পার্শ্বে আত্ম ব্যতিরিক্ত কোন বস্তুই প্রার্থনীয় নাই—যাঁহার সমস্তই আত্মস্বরূপ হয়ে যায় সে কিসের দ্বারা কাহাকে দেখবে, শ্রবণ করবে বা মনন করবে। এরূপ জ্ঞানোদয়ের পর সে কি আর কোন বস্তু কামনা করতে পারে? যিনি আত্মকামত্ব নিবন্ধন আত্মকাম হন, তিনিই অকাম ও অকাময়মান; সুতরাং তিনি বিমুক্ত। কেননা, যাঁহার আত্মাই সর্ব্বময় হয়ে যায় তাঁহার পক্ষে কখনও অনাত্ম কোন পদার্থই কাম্য (প্রার্থনীয়) হতে পারে না। অতএব

কামনা না থাকায় অকাময়মান পুরুষ কখনও পুনর্জন্ম লাভ করে না, পরন্তু দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিমুক্ত হয়।

৯। এবম্বিধ অকাময়মান পুরুষের কর্ম্ম সম্ভব হয় না, তন্নিবন্ধন পরলোক গমনও করতে পারে না। সেহেতু তাহার প্রাণসমূহ এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও উৎক্রমণ করে না অর্থাৎ দেহ হতে উর্দ্ধগামী হয় না। সেই বিদ্বান জ্ঞানী আপ্তকাম পুরুষ আত্মকামত্ব নিবন্ধন এখানেই ব্রহ্মস্বরূপ হন। এবম্বিধ সেই পুরুষ যে কিরূপে মুক্তিলাভ করে তাহা বর্ণিত হতেছে। যে লোক সুষুপ্তি অবস্থাপন্নের ন্যায় নির্ব্বিশেষ, অদ্বৈত, নিত্য চৈতন্য-জ্যোতিঃ স্বভাব আত্মাকে (আপনাকে) দর্শন করে, সেই অকাময়মান পুরুষের কর্ম্মাভাববশতঃ গমনের কারণ বিলুপ্ত হওয়ায়, বাক্ প্রভৃতি প্রাণসমূহ উর্দ্ধগামী হয় না। পরন্তু সেই জ্ঞানী পুরুষ যদিও দেহবানের ন্যায়ই (দেহীর মত) দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি এখানে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ বলেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাঁহার ব্রহ্মভাব প্রবুদ্ধ হওয়ায় ইহজন্মেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার আর দেহপাতের অপেক্ষা থাকেনা। ব্রহ্মবিদের মুক্তি দুই প্রকারে হতে পারে। এক—দেহসত্ত্বে, বর্ত্তমান জন্মে ; দ্বিতীয়—দেহপাতের পর, বিদেহ মুক্তি।

সম্প্রত্তি বিদ্যা
(৩)

১। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণে এই সম্প্রত্তি বিদ্যার অবতারণা প্রসঙ্গে, ৭০।১৬ শ্লোকে বলা হয়েছে, মনুষ্যলোক পিতৃলোক এবং দেবলোক—ত্রিবিধ লোক অর্থাৎ ভোগস্থান প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একমাত্র পুত্র দ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করতে পারা যায়, অন্য কর্ম্ম দ্বারা নহে।

কর্ম্ম দ্বারা একমাত্র পিতৃলোকই জয় করতে পারা যায় এবং বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় করতে পারা যায়। লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকই শ্রেষ্ঠ। এই কারণে পণ্ডিতগণ দেবলোক লাভের সাধনভূত বিদ্যার প্রশংসা করে থাকেন। এখানে জয় অর্থ ভোগায়ত্ত করা।

২। পুত্র কি প্রকারে মনুষ্যলোক ভোগায়ত্ত সাধন করে তাহা বলা হতেছে। অথাতঃ সম্প্রত্তি……। সম্প্রত্তি অর্থ সম্প্রদান—পুত্রেতে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভার সমর্পণ] লোক যখন আপনাকে আসন্নমৃত্যু মনে করে, তখন পুত্রকে আহ্বান করে তাকে বলে, তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ এবং তুমি লোক। পিতা এরূপ বললে পর সেই পুত্র প্রতিবচনে বলেন—হাঁ, আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক। ইহার অর্থ এই যে, আমার যাহা কিছু অনুক্ত, যাহা কিছু অধীত বা অনধীত অর্থাৎ অধ্যয়ন অবশিষ্ঠ আছে, তুমিই সেই সকলের ব্রহ্ম অর্থাৎ তুমিই তৎসরূপ—আমার কর্ত্তব্য অধ্যয়ন তুমিই পূর্ণ করবে। যে কোনও যজ্ঞ (আমার কর্ত্তব্য ছিল), তুমি সমুদয়ের যজ্ঞস্বরূপ অর্থাৎ তুমি আমার করণীয় যজ্ঞ সম্পাদন করবে, আর যে কোন লোক (ভোগস্থান) জয় করা, আয়ত্ত করা আমার উচিত ছিল, তুমি সে সকলের লোক স্বরূপ অর্থাৎ তুমি সে সকল লোক জয় করবে।

৩। এই পরিমাণই এ সমস্ত গৃহীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই পুত্র আমার কর্ত্তব্যভার নিজে গ্রহণ করে, এই জগৎ হতে প্রস্থিত আমাকে পালন করবে। এবম্বিধ সৎপুত্র (পিতার অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্যভার গ্রহণকারী পুত্র) ইহলোকের কর্ত্তব্যতা-বন্ধন হতে পিতাকে বিমোচিত করবেন। সেইজন্যই উক্ত প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত পুত্রকে পিতার লোক্য—স্বর্গাদি লোক জয়ের উপযোগী বলা হয়।

৪। এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন সেই পিতা যে সময় আপনার কর্ত্তব্যভার পুত্রের উপর অর্পণ ক'রে এই পৃথিবী হতে প্রয়াণ করেন—মৃত্যুগ্রস্ত হন তখন তিনি বাক্ মন ও প্রাণ দ্বারাই পুত্রেতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পুত্রেতে ব্যাপ্ত হন।

অভিপ্রায় এই যে, সেই পিতার বাক্, মন প্রাণ সেই সময়ে (মৃত্যুগ্রস্থ সময়ে) অধ্যাত্ম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ দৈহিক সীমায় আবদ্ধ থাকবার কোন কারণ না থাকায়, স্বীয় প্রকৃতিরূপ আধিদৈবিক পৃথিবী জল অগ্নি প্রভৃতি রূপে, সর্ব্ববস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন।

পিতাও বাক্ মন প্রাণকে আত্মভাবে ভাবনা করায় উক্ত বাক্ মন ও প্রাণের সহিত প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন। কারণ পিতা তখন এরূপ ভাবনাসম্পন্ন হন, আমি হতেছি অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিবিধভাবে বিস্তৃতিপ্রাপ্ত অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন বাক্ মন ও প্রাণস্বরূপ। সেজন্য পিতা তখন প্রাণের অনুবৃত্তি বা অনুসরণ করে থাকেন। পিতা তখন সকলেরই আত্মস্বরূপ হন। সুতরাং পুত্রের সঙ্গেও অভিন্ন হয়ে পড়েন। অতএব 'এভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি' বাক্য যুক্তিযুক্ত হয়েছে। অভিপ্রায় এই যে, যে পিতার পুত্র এরূপ অনুশিষ্ট বা সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তিনি পুত্ররূপে ইহলোকেই বর্ত্তমান থাকেন। তাঁহাকে কখনও মৃত বলে মনে করা উচিৎ নহে।

৫। পুত্র শব্দের যোগার্থ (৭১।১৭ শ্লোক) পিতা কর্ত্তৃক যদি কখনও কোন প্রকারে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পাদিত থাকে, তাহা হলে সেই পুত্র নিজে অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা পূরণ ক'রে পিতার সেই অসম্পাদিত স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ সেই কর্ত্তব্যতা-বন্ধন হতে পিতাকে বিমুক্ত করে, যেহেতু পুত্র অসমাপ্ত কর্ত্তব্য পরিপূরণ দ্বারা পিতাকে পরিত্রাণ করে সেইহেতু পুত্র নামে প্রসিদ্ধ। ইহাই পুত্রের পুত্রত্ব অর্থাৎ পুত্র সংজ্ঞার কারণ যে, সে পিতার ছিদ্র অর্থাৎ অপূর্ণতা পূরণ ক'রে পরিত্রাণ করে। সেই পিতা মৃত হয়েও এবম্বিধ পুত্র দ্বারা ইহলোকেই প্রতিষ্ঠিত (বর্ত্তমান) থাকেন। এই প্রকারে উক্ত পিতা ঈদৃশ পুত্র দ্বারা এই মনুষ্যলোক জয় করেন। এরূপে পুত্রেতে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভারার্পণকারী পিতাকে দৈব অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধীয় এই অমর প্রাণসমূহ প্রবেশ করে থাকে।

৬। ৭২।১৮ শ্লোক। পিতা পুত্রেতে কি প্রকারে প্রবেশ করেন তাহা এস্থলে উক্ত হতেছে। পৃথিবী ও অগ্নির অধিদেবতা বাক্ যথোক্ত সম্প্রত্তিকারী

পুরুষে প্রবেশ করে। তাহাই দৈবী বাক্, যাহা দ্বারা যাহা বলা হয় তাহা তাহাই সম্পন্ন হয় অর্থাৎ তাহার অমোঘ বাক্‌শক্তি লাভ হয়; তিনি বাক্‌সিদ্ধ হন।

৭। পৃথিবী ও অগ্নির দৈবী অধিদেবতাস্বরূপ বাক্; ইহাতে যিনি যথোক্ত সম্প্রত্তি সম্পাদন করেছেন, তাহাতে প্রবেশ করে। পৃথিবী ও অগ্নিরূপা বাক্ হতেছেন সর্ব্বপ্রাণীর বাক্যের উপাদান বা উৎপত্তির কারণ স্বরূপ। কিন্তু দেহাশক্তি-দোষে সেই বাক্ নিরুদ্ধভাবে পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। জ্ঞানীর সেই আসক্তি দোষ দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং পরিচ্ছেদ-জনক আবরণও ভেঙ্গে যায়, তখন আবরণ ভঙ্গে জল ও প্রদীপ প্রকাশের ন্যায় বাক্‌ও বিস্তৃতি লাভ করে থাকে। সেই দৈবী বাক্-ই অসত্যতাদি দোষশূন্য বিশুদ্ধ। যে ব্যক্তি নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, এই দৈবী বাক্য যাহা যাহা বলে, তাহা তাহাই হয়। অর্থাৎ ইহার বাক্য অমোঘ, অব্যাহত হয়!

৮। এই প্রকার পুত্র দ্বারা মনুষ্যলোক, কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যা দ্বারা দেবলোক জয় করাই পুত্র কর্ম্ম ও অপরাবিদ্যার (ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন) প্রধান ফল (মোক্ষসাধন বিষয়ে নহে)। পুত্রের দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যারহিত সংসারী জীবেরই মনুষ্যলোক জয় সম্ভবপর হয়, পরন্তু পরমাত্মবিৎ জ্ঞানী লোকের সম্বন্ধে নহে। এতদ্বিষয়ে শ্রুত্যন্তরে দৃষ্ট হয়, আমরা সন্তান লাভ করে কি করব—তাহা দ্বারা কি করিব যাহা দ্বারা আমাদের পরমাত্ম লাভ সম্ভব হবে না?

৯। কেহ কেহ বলে থাকেন যে, পিতৃলোক ও দেবলোক জয় করা শব্দের অর্থও পিতৃলোক হতে ব্যাবৃত্তি (বিরক্তি) ভিন্ন আর কিছু নহে। অতএব একসঙ্গে পুত্র কর্ম্ম ও অপরাবিদ্যার অনুষ্ঠান করলে যখন এই ত্রিবিধ লোক হতে লোকের নিবৃত্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তখন বৈরাগ্যসম্পন্ন পুরুষ ক্রমে পরমাত্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে তদ্দ্বারা মোক্ষলাভ করে থাকেন। অতএব পরম্পরা সম্বন্ধে পুত্রাদি সাধনত্রয় মোক্ষলাভেরই উপায়স্বরূপ। উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রুতি বিরুদ্ধ। পুত্র ও কর্ম্মাদি সাধনগুলি যদি সত্য সত্যই মোক্ষসাধন হত, তা হলে কখনও মোক্ষসাধন পুত্রকে লৌকিক সাধনে বিনিযুক্ত করা হত না।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জয়নগর-মজিলপুর নিবাসী শ্রীবিভূতিভূষণ (কালিদাস) চক্রবর্ত্তীকে তারানাথ স্বরচিত নিম্নলিখিত গানটি গাইবার জন্য দেন।

বাহার মিশ্র (ভৈরবী)

গগনে জাগিল মহাকাল।
ঘন ডম্বরু বাজে ভীম রুদ্র সাজে
জাগে ভৈরব আজি মৃত্যু করাল॥
মরণ আঁধার কোলে জীবন আলোকে জ্বলে
সংহার বেশে দেখা দিল যে ভয়াল—
জাগে ভৈরব আজি মৃত্যু করাল॥
প্রলয় ঝঞ্ঝা শেষে নিশার স্বপন
যুগে যুগে আনিল যে অমর মরণ
আজি অমানিশা শেষে আসিবে নূতন বেশে
শঙ্কর শিব সাজে সাজিয়া দয়াল
জাগে ভৈরব আজি মৃত্যু করাল॥

দ্রষ্টব্য: ৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যার তাৎপর্য্য বোধসৌকার্য্যার্থে ১০৮ পৃষ্ঠার পর (১) পরলোক ও জন্মমৃত্যু প্রবাহের স্বরূপ (২) দেহ-বিমোচন এবং তৎপরবর্ত্তী অবস্থা (৩) সম্প্রতি-বিদ্যা শীর্ষক তিনটি বিশেষ নিবন্ধে উহা আরও স্পষ্টীকৃত করা হল।

স্মৃতিতর্পণ

(১)

—দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিমগিরি ক্রোড়ে গাড়োয়ালের শ্রীনগরে
অবতীর্ণ হন প্রমথেশ বটুকভৈরবের বরে
শুভ কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়ার পরম লগনে
বারশো ত্রি-পঞ্চদশ সনে।

কার্ত্তিকের সেই পরম উত্তম শিব-লগনে
এলেন ধরায় যে দেবশিশু
সর্ব্ব ব্যোমকেশ বিশ্বনাথ দেব দেব ভীম গঙ্গাধর
ক্ষেপা তারানাথ তিনি।

গিরিশিরে কত জেগেছে প্রভাত,
মিলালো রক্ত-সন্ধ্যা;
সন্তানের তরে করে শিবপূজা
কে ঐ রমণী বন্ধ্যা।
বঙ্গজ দ্বিজকুলের কামিনী
চিনি যেন তাঁরে চিনি,
বিশিষ্ট রাজ আমাত্যের
সহধর্ম্মিনী তিনি।
তারার জননীর পূজায়
খুসী হয়ে ভোলানাথ
স্বপ্নে দিলেন তাঁহারে বর,
আসিবেন তারানাথ।
জননী পুত্রে ধরিবে বক্ষে
মহেশ্বরের বরে;

রুদ্রদেবের সে বরপুত্র
কিন্তু রবে না সংসারে।
জননীর কোলে এল শিশু তারা
মায়ের নয়নমণি ;
পলক অদর্শনেতে জননী
মণিহারা যেন ফণি।
কাটিল বাল্য, এল কৈশোর
কিশোর বালক তারা ;
তখনি তাঁহার অন্তর মাঝে
বহিছে ভাবের ধারা।
চলে যায় বনে, দূরে নির্জ্জনে
চলে যায় গিরিচূড়ে,
কে যেন তাঁহারে ডেকে নিয়ে যায়
মধুর বাঁশীর সুরে।
সংসার তার মন কেড়ে নিতে
মানিয়াছে পরাজয়,
আপনার মনে আপনি সে ক্ষেপা
আপনাতে কথা কয়।
সে কথা নহে তো তোমার আমার
সে কথায় জাগে জ্বালা,
হৃদয় মথিয়া জাগে জিজ্ঞাসা,
কোথা জ্বলে সেই আলা ?
যে আলোতে ভাতি ওঠে অমারাতি
যে আলোতে হৃদি জাগে
যে আলোতে জেগে ওঠে অন্তর
পুণ্য অরুণ রাগে।
পারিল না তাই বাঁধিতে তারারে
পিতামাতা সংসার;

কে রুধিবে তাঁরে, যে নিয়ত মনে
জানে ভগবানে পরাৎপর সারাৎসার।
সংসার বিরক্ত চির অনাসক্ত
কাহার সাধ্য তাঁহারে বাঁধে সংসারে ?
কিশোর বালক গৃহ ছেড়ে যায়
কাঁদে পিতা, কাঁদে মাতা !
সাধনার তরে কত না পুণ্য
তীর্থে ভ্রমিল তারা ;
এল অবশেষে গীর্ণাহার পাহাড়ে,
অন্তর ভাবে-হারা ॥
স্বপন বিভোল আঁখির সুমুখে
মেঘে টুটে আজ আলো ফুটে
চিনি যেন তারে, তবু প্রহেলিকা,
সে কি কায়া, না-না ছায়া !
মেঘের মূরতি যেন ইসারায়
দেখাইল দিশা তারে
কানে আসে বাণী বামার নিকটে
বীরভূমে চলে যা রে।
হিমগিরি হ'তে তুহিন ধবল
নির্ঝরিণীর ধারা
হিল্লোলে তুলি কলকল্লোল
তারাপীঠে হোলো সারা
বামা আর তারা, তারা আর বামা
তুজনা তুজনে মাগি
যেন এ ধরায় লভেছে জনম
তুজনা তুজন লাগি।
সিদ্ধসাধক ভৈরব বামা
তারাকে দানিল দীক্ষা

ভৈরব হোলো ক্ষেপাবাবা তারা
লভি বীরাচারে শিক্ষা।
পলাশীর মাঠে বাংলা পড়িল
অধীনতা শৃঙ্খল
জাতির সে গ্লানি বুঝি তারানাথে
করেছিল চঞ্চল।
পলাশীর মাঠে জুড়নপুরেতে
তারানাথ বুঝি তাই,
লভিতে সিদ্ধি বিছালো আসন,
করিল সাধন ঠাঁই।
বীরাচারী তারা শিব শঙ্কর
প্রমত্ত ভৈরব,
শুভ্র সৌম্য বরতনুখানি
সুষমার বৈভব।
জ্ঞানে বিজ্ঞানে পণ্ডিত তারা
দীপ্ত ধর্ম্মে কর্ম্মে ;
বজ্রের চেয়ে সুকঠিন, আর
পুষ্প থেকে মৃদু মর্ম্মে।
রাজনীতিবিদ্ এসেছে ছুটিয়া
লভিবারে উপদেশ,
বিদেশী বণিকে বিতাড়িয়া কিসে
উদ্ধার হবে দেশ ?
রাজপুরুষের কত নিপীড়ন
সয়েছেন তারানাথ ;
চিরনির্ভীক কখনও সে সবে
করেনিক' দৃকপাত।
তাপস, সাধক, ভৈরব তারা
বিপ্লবী তারানাথ

ধন্য হয়েছে এ ভারতভূমি
তারারে কোলেতে লভি।
অযুত ভক্ত ধন্য হয়েছে
জেনেছে যোগী সে কে ?
সে-ই যোগী যিনি নিজেকে যুক্ত
করেছেন আত্মাতে।
পরমব্রহ্ম সততযুক্ত
আছেন মোদের সাথে,
তাঁহাকে চিনিতে পারি মোরা শুধ্
আত্মার চেতনাতে।
দিকে দিকে আজি রণ-হুংকার
বাজে কলুষের ডঙকা ;
সাধকের বাণী তাহারে ছাপিয়া
ঘোষিছে নাহিরে শঙকা।
জীবনযুদ্ধ জিনিবার যাদু-
মন্ত্র করিতে শিক্ষা
কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্মেরে রাখি
লহ জীবনের দীক্ষা।
কর্ম্ম ধর্ম্ম পরিক্রমায়
পড়েছে চরণ যেথা,
গড়িয়া উঠেছে যোগী তাপসের
আশ্রম সেথা।
ধন্য হয়েছে বহরমপুর
ধন্য ঐ উমাবন ;
ক্ষেপাবাবা তারানাথের তপ
সাধনার তপোবন।
এ উমাবনের নিভৃতে নিরজনে
বেঁধেছিল ক্ষেপা ঘর

রুদ্র বিভূতি সম্বরি হোলো,
শান্ত মহেশ্বর।
কর্ম্মে মহান ধর্ম্মে মহান,
তাপস ব্রহ্মচারী ;
জীবন হয়েছে ধন্য বন্দি
চরণাম্বুজ তাঁরি ॥
এই উমাবনে সিদ্ধতাপস
পেতেছেন যোগাসন,
পূতঃ এই মাটী, পূতঃ উমাবন
পূতঃ এই আশ্রম।
নাই তারানাথ তাই কি তাঁহার
আসন আজিকে শূন্য ?
এ মাটীর প্রতি ধূলিকণা সে যে
তারার পরশে ধন্য।
এ উমাবনম্ হেথা হতে লব
তারার মাভৈঃ মন্ত্র ;
পঞ্চভূত-বন্ধন নাশ
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।
এ উমাবনম্ হয়েছে তীর্থ—
চরণ পরশে যাঁর
সেই ক্ষেপাবাবা তারার চরণে
প্রণমি বারংবার।

উমাবনম্
বহরমপুর,
মুর্শিদাবাদ

স্মৃতিতর্পণ

(২)

—অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়

আমার জানা তো হলো না জীবনে
তুমি যে আমার কত আপনার
আমারে জানাতে দিন বয়ে গেল
লুটানো হল না তো চরণে
কবে অভিমানের বাঁধ যাবো গো আমার
আঁখিনীর স্রোতে ভাসিয়া
কবে যাপিব আমি দিবস রজনী
তব প্রেমসিন্ধু তটে বসিয়া
কবে পারিব জানিতে
তুমি যে আমার সাথী জীবনে-মরণে
কবে সকল ছাড়িয়া রহিব গো
আমি দীনের দীন-টি সাজিয়া
তোমার দাসানুদাসের চরণধূলায় রহিব ধূসর হইয়া
কবে সকল ভুলিয়া রসনা আমার
রহিবে গো তব গুণগানে কীর্ত্তনে।